হলদে বাড়ি

যৌথ

শম্বুক, যযাতি, স্বখাত

রোগ, মহাশ্বেতা কুমারী, শুক্লা

পুনরুক্তি, হাসপাতাল, সিঁদুর, হলদে বাড়ি

শ্রীনারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়

বন্ধুবরেষু

যৌথ

বাড়ি থেকে বের হবার আগে অনুরূপ সদ্যনির্মিত জলচৌকিখানা একাই দু'হাতে উঁচু ক'রে নিয়ে এসে ছোট ভাই স্বরূপের সামনে ফেলে দিয়ে বলল, নে বাতার চার পাশ ঘুরিয়ে লতাপাতা ফুলটুল যা পারিস ক'রে দিস। আমি যাচ্ছি হাঠখোলা, আরো কিছু কাঠ নিয়ে আসতে হবে সরকারদের আড়ৎ থেকে। ওসব কুঁড়ে কাজ করবার সময় নেই আমার। শালার সাউব সখ দেখ; কালী প্রতিমার চৌকি হবে তা আবার ফ্রেমের ওপর কস্কা না হলে চলবে না। বেশি খাটিস্‌নে, পয়সা কিন্তু বেশি দেবে না।

স্বরূপ হেসে বলল, আচ্ছা সেজন্য ভেবো না দাদা।

বাড়ি থেকে নেমে অনুরূপ হালোটের পথ ধরে। যতটা দেখা যায় অনুরূপের দ্রুত গমনভঙ্গির দিকে স্বরূপ অপলকে চেয়ে থাকে, চলমান মানুষকে কি সুন্দর দেখায়। ধীরে ধীরে একটা দীর্ঘনিশ্বাস বেরিয়ে আসে স্বরূপের। জীবনে আর কোনোদিন সে চল্‌তে পারবে না। বহুকাল পরে আজ ক'দিন যাবৎ ক্ষোভটা আবার নতুন ক'রে জাগছে স্বরূপের। এতদিন সে যেন একথা ভুলেই ছিল। নিজের পায়ের অভাব বহুকাল তার মনে ছিল না। দাদা বউদির অনুতপ্ত লজ্জা স্নেহ কৃতজ্ঞতা তার সমস্ত ক্ষোভকে ভুলিয়ে রেখেছিল। দাদার ব্যবহারে নিজের দুঃখের কথা মনে করতেও লজ্জা হোতো স্বরূপের। তার শোক আর অনুশোচনার

সান্ত্বনা স্বরূপকেই দিতে হোতো। এত ভেঙ্গে পড়েছিল অনুরূপ। কিন্তু দিনের পর দিন সময় বদলায়, আর বদলায় মানুষের মন। কিন্তু সময় কি সত্যই বদলায়—না মানুষের পরিবর্তনে সময় বদলালো বলে মনে হয়। কিন্তু আগের মত তেমনই তো দিনের পর রাত রাতের পর দিন আসছে ; ঋতুর আবর্তন ঘটছে ঠিক একই নিয়মে। সামনের কৃষ্ণকলি গাছটা তেমনি বছরে একবার ফুলে ভেঙ্গে পড়ছে, ঝরে ঝরে শূন্য হয়ে যাচ্ছে গাছ ; কিন্তু আবার বছর ঘুরে আসছে সেই ফুল ফোটার পালা। না সময় ঠিক এক রকমই বোধ হয় থাকে। বদলায় কেবল মানুষ—মনে আর ব্যবহারে।

কম দিন কি হোলো ? সাত সাতটা বছর ঠিক একই ছোট কামরায় বন্দীভাবে কেটে গেল স্বরূপের। আরো কত সাত বছর জীবনের বাকি কে জানে। সেই দুর্ভাগ্যের দিনটা স্বরূপের স্পষ্ট মনে পড়ে। এতদিনে একটা কথাও সে বিস্মৃত হয়নি। অনুরূপের বড় ছেলে বলুর অত্যন্ত জ্বর। তিন বছরের শিশু দুঃসহ উত্তাপে ছটফট করছে। আর পিপাসা। পৃথিবীর সমস্ত জল শুষে না নিলে তার তৃষ্ণার যেন আর নিবৃত্তি হবে না। কিন্তু ডাক্তার বলে গেছেন জল নয়, যদি দিতেই হয়, কচি ডাবের জল ফোঁটা ফোঁটা ক'রে দেওয়া যেতে পারে। গাছ তো আছে একটা নিজেদের, বেশ বড় গাছ, নারকেলও অনেক। কিন্তু নারকেল গাছে উঠবার তেমন অভ্যাস নেই। স্বরূপ ইতস্তত করছে, দেখে অনুরূপ ধমক দিয়ে বলল, ছেলে যায় তৃষ্ণায় মরে আর তুই গড়িমসি করছিস। নিয়ে আয় না ডাবটা পেড়ে। ধমক খেয়ে লজ্জিতভাবে স্বরূপ গিয়ে গাছে উঠেছিল। ওঠার সময় কোনো অসুবিধাই তো হয়নি, নামার সময়ই যত বিপত্তি। তাও বেশির ভাগই তো নেমে এসেছিল। ওখান থেকে পড়ে গেলে হয়

তো তেমন কিছু হোতো না যদি ভাঙ্গা শিশি বোতলের বাক্সটা ওখানে না থাকত। বাক্সটা ঘর পরিষ্কার করার সময় অন্তরূপ ওখানটায় ঠেলে রেখেছিল। আর সরিয়ে নেওয়া হয়নি। তারপর একটু একটু ক'রে কাটতে কাটতে জেলা শহরের সিভিল সার্জেন তার দুটো পায়েরই হাঁটু পর্যন্ত বাদ দিয়ে দিলেন। মাঝখানে একবার ক'লকাতায় অন্তরূপ তাকে নিয়ে গিয়েছিল। কিন্তু তখন আর সময় নেই। সেখানকার ডাক্তাররা বলেছিলেন, প্রথমেই নিয়ে এলে অন্যরকম হোতো। ধলু বেঁচে উঠেছে। আশ্চর্য তারপর থেকে তার আর কোনো কঠিন অসুখ হয়নি। আর স্বরূপও তো জীবনে মরে যায়নি। নিচের দিকটা না থাকলেও শরীরের বাকি যেটুকু আছে সেটুকু তো সুন্দর এবং স্বাস্থ্যবান। ফাঁড়াটা কারো জীবনের ওপর দিয়ে যায়নি। কেবল পায়ের ওপর দিয়ে গেছে! এর চেয়ে বড় দুর্ঘটনা তো ঘটতে পারত। একথা অন্তরূপকে একদিন বলতে শুনেছে স্বরূপ। এমন কথা আগেকার দিনে অবশ্য অন্তরূপ বলত না। কিন্তু মানুষ যে একই কথা চিরদিন বলবে তার কি মানে আছে? একেক সময় যদি তার একেক কথা মনে আসে তা সে বলবে বই কি।

জল চৌকিটা টেনে নিয়ে উড্‌পেনসিল দিয়ে তার পায়া আর বাতার ওপর লতাপাতার নক্সা আঁকতে লাগল স্বরূপ। পরে এগুলিকে বাটালি দিয়ে কেটে কেটে তুলতে হবে।

ভাঁড়ার থেকে কিছু ডাল নিতে এসে বারান্দা দিয়ে ঘরে ঢুকবার সময় মল্লিকা একটু থেমে দাঁড়াল। স্বরূপের কাঁধের ওপর দিয়ে মুখ বাড়িয়ে হেসে বলল, ও, লতা পাতার ছবি। আমি ভাবলুম বুঝি বসে বসে কারো মুখ আঁকছ। কি মনোযোগ বাপরে বাপ! একজন মানুষ এসে গায়ের ওপর পড়লেও হুঁস হয় না। স্বরূপ বলল, হুঁস হলেই যে গায়ের ওপর থেকে মানুষটি আবার সরে যাবে। তার চেয়ে বেহুঁস থাকাই

ভালো। যেয়ো না, কেবল লতাপাতাই নয়। মুখও একখানা আঁকছি।
মল্লিকা বলল, কার মুখ।
সে কথা মুখে বলা যায় না।
আহা হা, এই ভাঙাচোরা হতকুৎসিৎ মুখ আঁকতে মানুষের বয়ে গেছে।
মল্লিকা হাসল।
হাসলে এখনও ভারি সুন্দর দেখায় মল্লিকাকে। অবশ্য সেই প্রথম যৌবনের রূপ আর নেই। গুটিতিনেক ছেলেমেয়ে হওয়ার পর মল্লিকার শরীর অনেক ভেঙে গেছে। মেজাজও হয়েছে খিটখিটে। তবু তার সামান্য এক আধটু হাসি ঠাট্টার সূত্র ধরে স্বরূপের মন সেই উচ্ছল অতীতের দিনগুলিতে ফিরে যেতে চায়। কাল যেন বদলায়নি। যেন ঠিক তেমনি আগের মতই আছে মল্লিকা। স্বরূপ যেন জোর ক'রে পরিবর্তনকে ঠেকিয়ে রাখবে। মাঝে মাঝে বিরক্ত হয় মল্লিকা, কিন্তু মাঝে মাঝে আবার ভালোও লাগে। স্বরূপের ব্যবহারে কোথাও যেন একটু মোহ আছে। একটু পর মল্লিকা বলে, যাই রান্না চড়িয়ে দিয়ে এসেছি, ছোট্ট ছেলেটা কি রকম চেঁচাচ্ছে শোন, এমন অশান্তই হয়েছে ছেলেটা, তুমি কিন্তু বেশ আছ ঠাকুরপো, এসব কোনো ঝামেলা নেই।
তা ঠিক। নিচু হয়ে স্বরূপ আবার নক্সার কাজে মন দিল।
কিন্তু ছেলেটি সত্যিই ভারি চেঁচাচ্ছে, বছর খানেক মাত্র বয়স, কিন্তু সমস্ত বাড়িটা যেন ছিন্নভিন্ন ক'রে ফেলবে এত আক্রোশ ওর, গলার এত তীক্ষ্ণতা।
স্বরূপ একটু বিরক্তির সুরে চেঁচিয়ে বলে, এই মিনি টেনু কাঁদছে কেন রে এত? শান্ত করতে পারিস না? নিয়ে যা ওখান থেকে কোলে ক'রে।
মিনি অনুরূপের বড় মেয়ে, বছর পাঁচেক বয়স। সে কোথায় খেলতে বেরিয়েছে। সে এল না, তার বদলে ছেলেকে স্তন দিতে দিতে মল্লিকা

নিজেই এল, ভারি যে চটে গেছ ঠাকুরপো। স্বরূপ বলল, তোমার ছেলের জ্বালায় কি স্থির থাকবার জো আছে। ক্রমেই এক এক ডিগ্রী ওপরে উঠছে এক একজন। এটি হবে সব চেয়ে সেরা দেখে নিয়ো।
বেশ অপ্রসন্ন হোলো মল্লিকা, জোর ক'রে একটু হেসে বলল, কি করব ভাই, মেরে তো আর ফেলতে পারি না।
মনে মনে হাসল স্বরূপ। ছেলেমেয়ের বিরুদ্ধে সামান্য কিছু বললেই মল্লিকা চটে যায়। ওদের কিছু বলা মানে মল্লিকাকেই আঘাত করা। অপমান করা। ছেলেমেয়ের সঙ্গে এত একাত্ম হয়ে গেছে মল্লিকা। তাকে যদি ভালোবাসতে হয়, শুধু তার দোষ ত্রুটিগুলিকেই নয়, তার সন্তানদের দোষ ত্রুটি স্বদ্ধ ভালবাসতে হবে।
স্বরূপ জবাব দিল, না, মেরে ফেলার দরকার হয় না, শান্ত করতে পারলেই হয়।
মল্লিকার মুখ কঠিন হয়ে গেছে, বলল শান্ত না হলে শান্ত করে কি ক'রে? বেশ, দিয়ে যাচ্ছি তোমার কাছে শান্ত কর দেখি তুমি।
স্বরূপ সত্রাসে বলল, না বউদি মাপ কর, আমার এখানে দিয়ে যাওয়ার দরকার নেই। কাজ আছে আমার।
মল্লিকা আরো ক্ষুব্ধ হোলো, কাজ আর মানুষের ও আছে। ভয় নাই ঠাকুরপো তোমার এখানে সত্যিই দিয়ে যাবো না। আমার ছেলে-মেয়েদের যে তুমি দেখতে পার না তা অত স্পষ্ট ক'রে না বলেলও মানুষে বুঝতে পারে। কি করব ভাই তোমাকে সংসারী করবার চেষ্টা কি আমরা কম করেছি। কিন্তু মেয়ে দিতে কেউ রাজি হোলো না, তাছাড়া তুমি নিজেও তো একেবারে ধুনুর্ভাঙ্গা পণ ক'রে বসলে আমি বিয়ে করব না।
স্বরূপ বলল, পণ না করলেই বুঝি ত্'পা কাটা ছেলের কাছে মেয়ে দিত? তাছাড়া তখন ভেবেছিলাম বিয়ে করলেই তোমার সঙ্গে

ঝগড়া আরম্ভ হবে। কিন্তু না বিয়ে করলেও যে ঝগড়া বাধতে পারে তা তো ভাবিনি।
মল্লিকা মুখ বাকিয়ে বলল, নাও তুমি তো আছ কেবল তোমার রসের কথা নিয়ে। খেয়ে না খেয়ে আর তো কোনো কাজ নেই দিনরাত। বলে মুখ ঘুরিয়ে মল্লিকা চলে গেল।

বিয়ে দেওয়ার চেষ্টা অনুরূপ করেছিল একথা ঠিক। কিন্তু কিছুতেই হয়ে ওঠেনি। তাছাড়া স্বরূপের নিজেরও অমত ছিল। নিজেই চলতে পারে না তারপর আবার একটা বোঝা। ব্যর্থ হয়ে অনুরূপ হতাশ ম্লান মুখে বলেছিল, আমার জন্যেই তোর যত দুর্দশা। কিন্তু বিয়ে তোকে আমি দেবই। মেয়ে কি আর ভূভারতে মিলবে না? টাকা হলে বাঘের চোখ মেলে, আর তো মেয়ে। পদ্মার পারটা দেখা হয়নি। ওদিকে একবার চেষ্টা ক'রে দেখতে হবে। কিন্তু আমার সংসারও তো আমার একার নয়, তোরও। সব ভার—আমার স্ত্রী-পুত্র সব তোকে আমি সঁপে দিলুম। সব তোর। সংসারের কর্তাও তুই।
একথা শুধু মুখেই নয়, কাজেও দেখাতে অনুরূপ প্রাণপণ চেষ্টা করত। সংসারের সমস্ত বিষয় সম্বন্ধে সে স্বরূপের পরামর্শ জিজ্ঞাসা করত। তার পরামর্শ গ্রহণও করত। হিসাবপত্র জমাখরচের খাতা তার কাছে এনে ফেলে রাখত। স্বরূপ যদি বলত, অত আমাকে দেখাচ্ছ কেন দাদা, আমি তো আর তেমন রোজগার করিনে? অনুরূপ বিস্মিত হয়ে বলত, রোজগার করিসনে মানে, আমার চেয়ে ঢের বেশি রোজগার করিস! শুধু ছুটাছুটি করি বলেই কি আমি বেশি রোজগার করি ভাবিস। আমার চেয়ে অনেক বেশি ক্ষমতা তোর, অনেক বেশি বুদ্ধি। তাছাড়া সূক্ষ্ম হাতের কাজে কেউ তোর জোড়া নেই।

কারুকার্য সত্যিই বেশভালো করে স্বরূপ, খাট আলমারিগুলির অলংকরণ ছাড়াও মাঝে মাঝে কাঠের উপর নানা রকম মূর্তি স্বরূপ বাটালি দিয়ে কুঁদে কুঁদে তুলেছে। নিজের চলবার শক্তি নেই বলে যেন বিশ্বের গতিশীলতাকে সে কাঠের ওপর রূপায়িত ক'রে তুলতে চায়। এ অঞ্চলে এমন কারিগর সত্যিই আর নেই।

শুধু সাংসারিক বিষয়েই নয়, অনুরূপ নিজের স্ত্রীকেও বেশির ভাগ সময় স্বরূপের পরিচর্যায় নিযুক্ত করেছে। বলেছে, আহা, আমাকে তোমার দেখতে হবে না। আমার হাত পা আছে; নিজেরটা আমি নিজেই ক'রে নিতে পারি। ওকে তুমি একটু দেখ। ওকে একটু ফুর্তিতেই রাখতে চেষ্টা কর। আমোদ প্রমোদের আমার অভাব কি, কত খেলাধুলো বন্ধুবান্ধব আমার, কিন্তু ওর তো এখন আর সেসব কিছু নাই। ওকে যাতে তুমি খুশিতে রাখতে পার, আনন্দে রাখতে পার, তাই কর। বড় আদরের ভাই আমার। এমন ভাই কারো হয় না। আত্মোৎসর্গের প্রেরণায় মনে হয়েছে স্বরূপকে এর চেয়ে বেশি কিছু দিতে পারলে যেন অনুরূপ খুশি হোতো।

কিন্তু অনুরূপের এই দান গ্রহণ ক'রে স্বরূপের তেমন তৃপ্তি ছিল না। সে আবার মল্লিকাকে তার দাদার কাছে পাঠিয়ে দিত। বলত, যাও আর বেশি ভদ্রতা করতে হবে না। মন যে কোথায় পড়ে আছে তাতো জানি।

মল্লিকা হেসে বলত, মন কি একটা আগলা ছেঁড়া নেকড়ার পুঁটুলি যে, কোথাও ফেলে রেখে আসব। মন আমার সঙ্গে সঙ্গে থাকে। গল্প করতে তোমারই বোধ হয় মন যাচ্ছে না। স্বরূপ গম্ভীর মুখে জবাব দিয়েছে, ঠিক বলেছ, আমি একটু অন্যমনস্কই আছি। একটা মূর্তির কথা ভাবছি। আচ্ছা, তুমি এখন যেতে পার।

মল্লিকা ক্ষুণ্ন হয়ে যেতে যেতে বলেছে, সারাদিন তো তোমার ঐ এক ভাবনা, কি যে তোমার ভাব কিছু বুঝতে পারিনে।

তারপর মল্লিকা যখন স্বামীর সঙ্গে কথাবার্তা আরম্ভ করেছে তখন হঠাৎ স্বরূপ ডেকে বলেছে, বউদি শুনে যাও তো, জল নিয়ে এস আসবার সময় এক গ্লাস।

শুনে অনুরূপ হেসে চুপে চুপে বলেছে, জলটা তো ছল, শুনে আসাটাই বড় কথা। এবার বুঝি মান ভঞ্জনের পালা। দেখে শুনে বরের চেয়ে দেবর হতেই লোভ যাচ্ছে কিন্তু।

মল্লিকা বলেছে, বেশ আমার কি, যাব না আমি।

না না ছি, বললাম বলেই নাকি ?

মল্লিকা অবশ্য কৌতুক ক'রে জল না নিয়েই উপস্থিত হয়েছে, কি আবার ডাকছ কেন ?

জলের জন্য বললাম যে ? জল আনলে না কেন ?

সত্যিই খুব তৃষ্ণা পেয়েছে ?

হ্যাঁ, কিন্তু জলেই এ যাত্রা মেটাতে হবে।

তারপর দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে অনেকক্ষণ গল্প ক'রে গেছে মল্লিকা।

কিন্তু সে সব দিন আর নেই। মল্লিকার অনেক কর্তব্য বেড়েছে। অনেক দায়িত্ব। অলক্ষ্যে—জীবনের, সংসারের বিচিত্র অভিজ্ঞতা তাকে দূরে সরিয়ে নিয়েছে। কেবল স্বরূপ রয়ে গেছে একই জায়গায়। সে পঙ্গু, সে নড়তে পারেনি। কেবল তার জীবনেই কোনো অভিজ্ঞতার ছাপ পড়ল না। এখন তার মাঝে মাঝে মনে হয়, ভূভারত খুঁজে অন্ধ, খঞ্জ, বোবা, বধির যেমনই হোক একটি মেয়েও কি পাওয়া গেল না স্বরূপের জন্য ? আর কিছু সে না হোক শুধু একটি মেয়ে ? মনে হয় অনুরূপ আর মল্লিকা ইচ্ছা ক'রে তাকে ঠকিয়েছে। কেবল সোহাগ

আদর ক'রে ভুলিয়ে রেখেছে, পাছে স্বরূপের নিজের সন্তান এসে সম্পত্তির অংশীদার হয়। স্ত্রীপুত্র নিয়ে সম্পূর্ণ আপন একটি সংসারের জন্য স্বরূপের মন হাহাকাব ক'রে ওঠে।

বেলা দুপুরের সময় হাটখোলা থেকে নৌকাভরা কাঠ নিয়ে অনুরূপ ফিরে এল। কী কাঠফাটা রোদ। অনুরূপ এসেই জিজ্ঞাসা করল, হয়ে গেছে কাজটা?

স্বরূপ বলল, না খানিকটা বাকী আছে, হয়ে যাবে'খন।

অনুরূপ রেগে গিয়ে বলল, হয়ে যাবে'খন? এতক্ষণ কি করেছিস বসে বসে। কাজ নেই কর্ম নেই, কেবল গল্প আর গল্প?

স্বরূপও চটে গেল, কাজ না ক'রে কি মাগনা খাই তোমার সংসারে? নিজের কাছেই নিজেকে একবার জিজ্ঞাসা ক'রে দেখ দেখি। কাজ আমি করি, না, করি না? খুব খাটিয়ে নিয়েছ, আর কেন? এত আমি করব কার জন্যে? কে আছে আমার সংসারে?

অনুরূপ কি বলতে যাচ্ছিল, হঠাৎ চুপ ক'রে গেল।

মল্লিকা এদিকে এসেছিল, অনুরূপ বাধা দিয়ে বলল, না দরকার নেই তোমার ওদিকে যাওয়ার, এত করেও যখন ওর মন পাওয়া গেল না। সংসারে নাকি ওব কেউ নেই, তখন তোমাকে আর যেতে দেব না আমি।

মল্লিকা হেসে বলল, এতকাল যেতে দিয়ে এখন তোমার আপত্তি হোলো এই বুড়ো বয়সে?

স্বরূপের কাছে গিয়ে মল্লিকা বলল, কি ভাই ঠাকুরপো, খুব যে ঝগড়া করা হচ্ছে। ঝগড়া করার পালা আমার সঙ্গে, তোমার দাদার সঙ্গে তো নয়।

স্বরূপ একবার মুহূর্তের জন্য মল্লিকার দিকে তাকাল, তার চোখে আর ঠোঁটের কোণে তীক্ষ্ণ ব্যঙ্গ যেন ঝলসে উঠল! মল্লিকা কি ভেবেছে

এমনি ছদ্ম সোহাগে আজীবন তাকে ভুলিয়ে রাখবে? নিজেদের গোপন উদ্দেশ্য চিরকাল তার কাছ থেকে লুকিয়ে রাখবে? মল্লিকা কি ভুলে গেছে সে চার সন্তানের মা? কোনো কথা না বলে স্বরূপ আবার তার কাজে মন দিল।
স্বরূপের চোখে কি ছিল কি জানি, মল্লিকার বুকে গিয়ে তা যেন তীরের মত বিঁধল। আরো কত দিনই তো স্বরূপ এমন রাগ ক'রে তার সঙ্গে কথা বলেনি, কিন্তু এমন ব্যথা তো কোনোদিন পায়নি মল্লিকা। অত্যন্ত বিমর্ষ মুখে মল্লিকা ফিরে গেল।
খাওয়া দাওয়ার পর মনটা একটু শান্ত হলে অনুরূপের মনে হোলো সত্যিই বড় স্বার্থপরের মত কাজ হয়েছে। সংসার নিয়ে, নানা বিষয় আশয় নিয়ে এতদিন সে এমন মত্ত হযে ছিল যে, স্বরূপের দিকে তেমন ক'রে তাকাবার কথা ইদানীং তার মনেই হয়নি। মল্লিকার ওপর তার সমস্ত পরিচর্যার ভার দিয়ে স্বরূপের বিয়ের কথা প্রায় ভুলেই বসেছিল অনুরূপ, অবশ্য চেষ্টা সে কম করেনি আগে, কিন্তু আরো চেষ্টা দরকার। টাকার দিকে অনুরূপ তাকাবে না, যেমন করেই হোক বিয়ে সে দেবেই স্বরূপের। তাছাড়া স্বরূপ ইচ্ছা ক'রে না করলে তো কোনো কাজ তাকে আর করতে বলবে না অনুরূপ।
বিকালে সে নিজেই কাঠের ওপর সূক্ষ্ম কারুকার্য করতে বসল। কিন্তু মনে যত-অটুট সংকল্পই থাক, হাত আর চলে না। এসব কাজ করতে ধৈর্য থাকে না অনুরূপের। এত দিনের অনভ্যস্ততায় সমস্ত চারুশিল্প যেন ভুলতে বসেছে অনুরূপ। কাজ কিছুতেই এগুলো না। বিরক্তি আর হতাশায় বারবার তার ধৈর্যচ্যুতি ঘটতে লাগল। ইদানীং এসব কাজে বড় একটা হাতই দেয়নি অনুরূপ। বড়বড় শাল গাছের গুঁড়ি এসেছে বন্দর থেকে। কাঠের কারবার ক'রে পয়সা করবার দিকেই

তার ঝোঁক ছিল। বিষয়আশয়, ক্ষমতা প্রতিপত্তি এই ছিল তার লক্ষ্য। কখন অলক্ষ্যে শিল্পীর দক্ষতা তার হাত থেকে খসে পড়ে গেছে সে টেরও পায়নি। মনের মধ্যে হঠাৎ যেন কেমন ক'রে উঠল অনুরূপের। শুধু স্বরূপই যে পঙ্গু তা নয়, শিল্পের দিকে নিজেকেও সে পঙ্গু ক'রে তুলেছে। এতদিন স্বরূপকে সে নিজেরই এক অংশ মনে করত। তার গৌরব, তার খ্যাতিতে নিজেকেই গর্বিত বোধ করত। আজ স্বরূপ যখন দূরে সরে যাচ্ছে, তখন অনুরূপের মনে হোলো তার খ্যাতি আর গৌরব নিয়েই সে যাচ্ছে—অনুরূপের জন্য তার কিছুমাত্র আর অবশিষ্ট রেখে যাবে না। অথচ সৌন্দর্যসৃষ্টির সম্পূর্ণ সুযোগ অনুরূপই তাকে দিয়েছে। সংসারের সমস্ত চিন্তা ভাবনা সমস্ত কাঠিন্য থেকে তাকে সে সন্তর্পণে দূরে সরিয়ে রেখেছে, না হলে এত কি বড় হতে পারত স্বরূপ। কিন্তু নেপথ্যে এই আত্মোৎসর্গের জন্য কোনো দামই থাকবে না অনুরূপের। সমস্ত কীর্তি, সমস্ত গৌরব কেবল স্বরূপেরই রয়ে যাবে।

স্নানের পর মাথা আঁচড়াবার সময় হঠাৎ বহুদিন পরে নিজের চেহারার দিকে চোখ পড়তে মল্লিকা চমকে উঠল। এত খারাপ হয়ে গেছে তার চেহারা, ভেঙ্গেচুরে এই ক'বছরে সে এমন জীর্ণ হয়ে গেছে, তা তো সে ধারণাও করতে পারেনি। ক্ষোভে আর লজ্জায় নিজের দিকে সে যেন নিজেই চাইতে পারল না। বহু সংকোচে সে স্বরূপকে খাবার পরিবেশন ক'রে এল। গোপনে একবার তাকিয়ে দেখল স্বরূপ ঠিক সেইভাবে আর তার দিকে চেয়ে নেই। অন্যমনে কি ভাবছে। মোহ তার চোখ থেকে খসে পড়ে গেছে আর মল্লিকার দেহ থেকে সৌন্দর্য আর যৌবন। মল্লিকার মনে হোলো স্বরূপের মোহই যেন এতদিন সেই সৌন্দর্যকে বাঁচিয়ে

রেখেছিল। নীরবে পরিবেশন ক'রে মল্লিকা চলে এল। কোনো কথা বলতে চেষ্টা করল না, স্বরূপও কোনো কথা বলল না।

কোলের ছেলেটা কাঁদতে লাগল; কিন্তু মল্লিকার আজ আর তাকে ধরতে ইচ্ছা করল না, কেমন যেন উদাস হ'য়ে গেছে মন।

রাত্রে গুহদের বাড়িতে ছেলেরা সখের থিয়েটার করবে। মেয়েদের বসবার জন্য আলাদা বন্দোবস্ত হয়েছে। পাড়ার মেয়েদের বিশেষ ক'রে নিমন্ত্রণ করেছে তারা, তাছাড়া অনুরূপের অবস্থা একটু ভালো হওয়ার পর ইদানীং খুব খাতির আর সম্মান করছে গুহরা।

মল্লিকা বলল, ছেলেপুলেরাই যাক, আমি আবার কি দেখব ওর।

অনুরূপ জবাব দিল, সে ভালো দেখায় না, যখন বলে গেছে এত ক'রে। খোকার অন্নপ্রাশনে ও বাড়ির মেয়েছেলেও এসেছিল, মনে নেই তোমার?

মল্লিকা সাধারণ একটা পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন শাড়ী পরল। অনুরূপ দেখে বলল, ও কি, না না ভালো একটা দামী শাড়ী পরে যাও। মনে মনে স্বামীর এই ব্যাপারে এই মনোযোগে মল্লিকা খুশিই হোলো, মুখে বলল, কিন্তু এদিকে যে বুড়ো হয়ে গেলাম, বয়স তো হয়েছে, এখন কি আর ও সব ফ্যাসান মানায়?

অনুরূপ বলল, ফ্যাসান অবশ্য আমিও পছন্দ করি না। তবু ভালো একটা দামী শাড়ী পরেই যাও। না হলে লোকে ভাববে বাড়িতে দালান দিলে হবে কি, অনুরূপ তেমনই কৃপণ আর ছোটলোকই রয়ে গেছে।

মাত্র এই? মল্লিকার আর একদিনের কথা মনে পড়ল। কি কথায় কথায় মল্লিকা বলে ফেলেছিল, আর এখন তো বুড়ো হয়েই গেলাম, বয়স কম হোলো না কি?

শুনে স্বরূপের কি রাগ, আমার সামনে মুখেও এন না ও সব কথা।

মল্লিকা হেসে বলেছিল, মুখে না আনলেই কি কথাটা মিথ্যা হয়ে যাবে? আমার বয়স তুমি জোর করেই কমিয়ে রাখবে নাকি ভেবেছ?

স্বরূপ জবাব দিয়েছিল, হ্যাঁ জোর করেই তো রাখব।

শাড়ীটা অবশ্য কি ভেবে মল্লিকা বদলিয়েই পরল, তারপর বলল, আর দেরি কোরো না, ঠাকুরপোর একটা বিয়ে দাও—খুব সুন্দরী মেয়ে যেন হয়। টাকার জন্য ভেবো না, এতদিন দেরি করাই ভারি অন্যায় হয়ে গেছে।

অনুরূপ ভেবে অবাক হোলো, হঠাৎ অপ্রাসঙ্গিকভাবে এ কথা বলল কেন মল্লিকা।

স্বরূপ নিজের কাজ নিয়ে ব্যস্ত। কি একটা নতুন মূর্তি খোদাই করছে যেন। আজকাল অনেক কম কথা বলে স্বরূপ, মল্লিকাকে ডাকাডাকিও তেমন করে না। নিতান্ত প্রয়োজনীয় কথা ছাডা আর বিশেষ কোনো কথাবার্তাও হয় না। মল্লিকার মাঝে মাঝে আসতে ভারি ইচ্ছা হয়, কিন্তু কোথায় যেন বাধে, কোথায় যেন একটু অভিমান আর সংকোচ লেগে থাকে। স্বরূপের মনের ভাব অবশ্য বদলায়নি। সে যেন এদের চাতুরী সব ধরে ফেলেছে; কেমন একটা ঘৃণাই তার মনে বদ্ধমূল হয়ে থাকে। গভীর মনোযোগে মূর্তি খোদাইর কাজ করতে থাকে স্বরূপ। ভিন্ন জেলার এক জমিদার বাড়ি থেকে বায়না দিয়ে পাঠিয়েছে। কাজ সুন্দর হলে টাকাও যেমন পাওয়া যাবে, যশও তেমন দূরে দূরান্তরে ছড়িয়ে পড়বে। নিপুণ অভ্যস্ত হাত স্বরূপের তেমনই চলতে থাকে। কিন্তু মূর্তির মধ্যে তেমণ লালিত্য আর সৌন্দর্য যেন আসতে চায় না। বিরক্ত হয়ে বার বার নতুন ক'রে স্বরূপ কাজ আরম্ভ করে।

অনুরূপ মনে মনে প্রতিজ্ঞা করেছে, এই দু'তিনটা মাস গেলে বিয়ে সে যেমন করেই হোক অগ্রহায়ণ মাসের মধ্যে দিয়ে দেবে স্বরূপের।

একটা সম্বন্ধ প্রায় ঠিক হয়েই আছে; কিন্তু সমস্ত সংসারে যেন আর রস নেই। জায়গায় বসে বসে স্বরূপ যেমন হাঁক ছাড়ত তেমন আর করে না। তার হাসিতে উল্লাসে সমস্ত বাড়ি যেমন চঞ্চল হয়ে উঠত, তেমন আর হয় না। কিন্তু মল্লিকা যেমন গৃহকর্ম করত, সন্তান পালন করত, তেমনি ক'রে যায়। কাঠের কারবার অনুরূপের তেমনি চলতে থাকে। কিন্তু সংসারটাও যেন শুকিয়ে কাঠ হয়ে গেছে। একেক সময় এই বিষয় আশয়, কারবারপত্র ভারি দুর্বহ মনে হয় অনুরূপের। বেশ আছে স্বরূপ, নিজের ধ্যানে নিমগ্ন হয়ে বেশ আছে সে, আর ছুটাছুটি দৌড়াদৌড়ি ক'রে অনর্থক নিজেকে ক্ষয় ক'রে ফেলছে অনুরূপ। বিয়ে ক'রে ছেলেপুলে নিয়ে অকালে বুড়ো হতে চলেছে। বুড়ো হতে চলেছে মল্লিকা। কিন্তু স্বরূপ নিজেকে ধরে রেখেছে, একটুও অপচয় হতে দেয়নি। যৌবনকে সে বেঁধে রেখেছে। সমস্ত ভবিষ্যৎ তার সামনে। আর অনুরূপ কেবল অতীতের বস্তু। এতকাল যে যৌবনের সৌন্দর্যকে সে আকণ্ঠ পান করেছে তা অনুরূপের মনে পড়ল না, ভবিষ্যৎকে সে যে আর স্বরূপের মত উপভোগ করতে পারবে না, এই ক্ষোভই তার মনকে বার বার আচ্ছন্ন ক'রে রাখতে লাগল।

কিন্তু হঠাৎ সেদিন স্বরূপের মুখের দিকে তাকিয়ে অনুরূপ চমকে উঠল, চুলগুলো উস্কোখুস্কো, চোখ দুটো লালচে। অনুরূপ ধমক দিয়ে বলল, খুব রাত জাগছিস বুঝি?

স্বরূপ বলল, না।

না তো শরীর দিনের পর দিন অমন খারাপ হচ্ছে কেন? কি এত কাজ। কি এমন তোর দুর্গোৎসব পড়েছে শুনি।

স্বরূপ অল্প একটু হাসল, ও কিছু না, তুমি ভেবোনা দাদা।

স্বরূপ তো বলল ভেবোনা, কিন্তু দু'দিন যেতে না যেতেই পড়ল জ্বরে। অনুরূপ বলল, কিরণ ডাক্তারকে কল দিই কেমন ?

স্বরূপ বলল, এত ব্যস্ত হচ্ছ কেন।

কিন্তু ব্যস্ত শেষ পর্যন্ত হতেই হোলো। কিরণ ডাক্তার বলে গেল, জ্বরটা ভালো নয়। কয়েকদিন বাদে বলল, ডবল নিউমুনিয়া। শহর থেকে পর পর দুজন ডাক্তারকে দেখাল অনুরূপ, কিন্তু কারো ভাবভঙ্গিতেই ভরসা পেল না। সদর থেকে আরো বড় ডাক্তার আনতে যাবে স্বরূপ তাকে ইসারায় থামিযে ফিস ফিস ক'রে বলল, যাবে যাও, বারণ তো তুমি শুনবে না। কিন্তু আমার বড় ইচ্ছা তুমি এ সময় আমার কাছে থাক।

অনুরূপ ফের ধমক দিতে যাচ্ছিল। কিন্তু উপস্থিত সবাই সেই পরামর্শই দিল। মরবার আগে স্বরূপ বড় ভাইকে তার একটা ইচ্ছা জানিয়ে গেল। তার শেষ অসম্পূর্ণ মূর্তিটা যেন সম্পূর্ণ করে অনুরূপ। অনুরূপ চোখের জলের ভিতর দিয়ে বলল, আচ্ছা, কিন্তু তোর হাতের কাজে বাটালি ধরতে কি আমি পারব !

স্বরূপ বলল, তুমি আমার চেয়ে অনেক ভালো পারবে।

শোকাচ্ছন্ন কয়েকটি দিন কাটল। অনুরূপের কোনো কাজে মন নেই, খেয়াল নেই কোনো দিকে। একদিন মল্লিকাই মনে করিয়ে দিল, ঠাকুরপো কি একটা মূর্তির কথা না বলেছিল শেষ সময় ?

অনুরূপ বলল, ঠিক ঠিক, তার শেষ ইচ্ছা তো রাখতে হবে। কোথায সেই মূর্তি ? যদি তাই নিয়ে একটু অন্যমনস্ক থাকা যায়, স্বরূপের কাজ নিয়ে ভুলে থাকতে হবে স্বরূপকে।

পাটের মোটা একটা চট দিয়ে ঢাকা মূর্তিটা স্বরূপের ঘরেরই এক

কোণে পড়ে ছিল। বড় ছেলের সাহায্যে ধরাধরি ক'রে মূর্তিটাকে আরো একটু সামনের দিকে এগিয়ে আনল অনুরূপ। চটটা সরিয়ে ফেলল। তবু এ'কয় দিনেই বেশ ধুলো জমেছে। মাকড়সা মাথার ওপর দিয়ে বুনে গেছে জাল।

অনুরূপ মল্লিকাকে ডেকে বলল, পরিষ্কার শুকনো একখানা ন্যাকড়া নিয়ে এসো তো।

আলমারীর মাথার ওপর থেকে ছেঁড়া কাপড়ের বোচকাটা পেড়ে ন্যাকড়া বের করতে একটু দেরি হোলো মল্লিকার। তারপর সেখানা হাতে ক'রে এসে বলল, এই নাও, কি মূর্তি কেটেছে ঠাকুরপো।

অনুরূপ রূঢ় কণ্ঠে বলল, দেখ চিনতে পার কিনা।

চেনা কঠিন নয়। মল্লিকারই আবক্ষ প্রতিকৃতি। এখনকার ভাঙাচোরা ক্ষয়ে যাওয়া মল্লিকার নয়। দশ বৎসর আগের সেই যৌবনোচ্ছলা সপ্তদশী মল্লিকা আবার এসে সামনে দাঁড়িয়েছে।

মূর্তিটাকে একবার দেখেই মল্লিকা সলজ্জে তাড়াতাড়ি সরে যাচ্ছিল, অনুরূপ হাত বাড়িয়ে তার শীর্ণ হাতখানা চেপে ধরল, যেয়ো না, দাঁড়াও।

মল্লিকা সভয়ে বলল, কি বলছ ?

অনুরূপ অদ্ভুত একটু হাসল, দাঁড়াও এখানে—বাকিটা তো আমাকেই শেষ করতে হবে।

শম্বুক

কচুরির গাটনায় সমস্ত নদীটা ঢাকা পড়ে আছে। জানালা দিয়ে যতটা দেখা যায় কেবল সবুজ পাতাওয়ালা বড় বড় কচুরি। দেখতেই ভয় করে। নিজেদের ঘাট দিয়ে যখন ছোট ছোট কচুরিগুলিকে ভেসে যেতে দেখত, ছেলেবেলায় ভারি আনন্দ হোতো সুপ্রিয়ার। সাঁতার দিয়ে অনেকগুলো ফুলসুদ্ধ একেকটা কচুরির ঝোপকে সুপ্রিয়া তুলে নিয়ে আসত। কচুরির গাছকে ছোট ফুল গাছের মতই সুন্দর মনে হোতো সুপ্রিয়ার। তখন কে ভেবেছিল তার রূপ এমন বীভৎস হতে পারে। তিন দিন ধরে গাটনা পড়ে আছে নদীতে। পারাপার সব বন্ধ প্রায়। অতি কষ্টে দু'একখানা ডিঙি নৌকো দেড় ঘণ্টা দু'ঘণ্টা বসে এপার ওপার হচ্ছে, ভিড় বাঁচিয়ে এপারে যে দু'চারজন মাষ্টার আর কেরানী সখ ক'রে এসে বাসা বেঁধেছে, খেয়াপারের এই ব্যবস্থাই তাদের সম্বল। আর কি অদ্ভুতই যে এখানকার পারাপারের ব্যবস্থা! একটা ব্রীজ ক'রে নিলেই তো হয়। কিন্তু জমিদার নাকি তা হতে দেয় না। তার চেয়ে বছর বছর খেয়াঘাট ইজারা দিয়ে জমিদারের অনেক লাভ। আর এখানকার লোকগুলিই বা কি কুড়ে। জমিদারের উপদ্রবই শুধু নয়, কচুরির অত্যাচারও সহ্য করে। কচুরিগুলিকে তারা ঠেলে সরিয়ে দিতে পারে না? অথচ পারাপার তাদের দৈনন্দিন প্রয়োজন। আর কি অদ্ভুত এই রূপগঞ্জ শহরের গড়ন। দু'দিকে দু'টুকরো হয়ে রয়েছে।

আচ্ছা, নদীই একে ভেঙ্গেছে না এমন টুকরো টুকরো ভাবেই এদের জন্ম? বোধ হয় তাই হবে। এ শহরের কোনো প্লান নেই। যার যে পারে খুশি ঘর তুলেছে, দোকান পেতেছে বাজার মিলিয়েছে। শহর? রূপগঞ্জ আবার শহর। একটা আদালত, স্কুল আর বাজার থাকলেই যদি তা শহর হোতো। কিন্তু রূপগঞ্জ নামটা ভারি সুন্দর। নাম। নাম আর রঙের জন্য সুপ্রিয়া যে কোনো জিনিসকে সহ্য করতে পারে। না; দৃশ্যটা নিতান্ত মন্দ নয় এখানকার। ওপারের সারি সারি গুদাম ঘরগুলির টিনের চালের ওপর জ্যোৎস্না এসে পড়ে রুপোর মত দেখাচ্ছে। আর তাদের এপারের খণ্ডটিকে মনে হচ্ছে ছোট্ট একটি দ্বীপের মত।
সুপ্রিয়া টের পাচ্ছে তার এলো ক'রে জড়ানো খোঁপার ওপর নীলাম্বর এসে আলগোছে তার আঙুলের ডগাগুলো রেখেছে। আদরের এই ভঙ্গিটুকু নীলাম্বরের পুরানো।
রাত তো অনেক হয়েছে। শুতে যাওনি কেন?
সুপ্রিয়া প্রশ্নের জবাব এড়িয়ে গেল, বলল, শেষ হোলো তোমার লেখা?
হ্যাঁ, হয়েছে মোটামুটি। নীলাম্বরের স্বর একটু উচ্ছল, একটু বা উল্লসিত, বাঃ চমৎকার জ্যোৎস্না তো বাইরে। শুতে যেতে আমারও ইচ্ছা করছে না। একটা গান করবে? আচ্ছা এখানে বসেই গুনগুন করোনা একটু। মানে গুনগুন করতে যদি পারত নীলাম্বরই করত। সুপ্রিয়া বলল, ভালো হয়েছে বুঝি লেখাটা? নিস্পৃহ উৎসাহহীন সুপ্রিয়ার স্বর, শুধু তাই নয়, অতি অনাবশ্যক একটা খোঁচা।

সন্ধ্যা বেলার কথাটা এতক্ষণে নীলাম্বরের মনে পড়েছে। একটু গম্ভীরভাবে বলল, কি ক'র বুঝলে?
সুপ্রিয়া তীক্ষ্ণ একটু হাসলে, আমাকে গান গাইতে বলছ যে। তোমার কলম দিয়ে যখন ভালো লেখা ঝরবে আমার গলা দিয়ে তখন

সুর ঝরবে না কেন। তোমার মন যখন গুনগুন করছে আমার মনেরও তখন গুনগুন করাই তো উচিত।
নীলাম্বর দাঁতে দাঁত চাপল, তারপর বলল, কিন্তু ঔচিত্য বড় কঠিন, বড় নীরস কিনা তাই ওদিক আমরা বড় ঘেঁষতে চাই না। আমার মন যখন গুনগুন করে তোমার তখন হুল ফোটাবার দিকে মন যায়। দুজনে মিলে আমরা একটি মৌমাছি। নীলাম্বরের স্যাণ্ডালের শব্দ ওঘর পর্যন্ত গিয়ে মিলিয়ে গেল।
ওপারের নদীর ধারের একটা চালা ঘর থেকে ঠন্‌ঠন্‌ শব্দ এতক্ষণ শোনা যাচ্ছিল। বোধ হয় ঝালাইকারদের ঘর হবে। অনেক রাত অবধি ওরা কাজ করে। সে শব্দ এখন বন্ধ হয়েছে। হয়ত এতক্ষণে তারা শুয়ে পড়ল।
কি দোষ ছিল সুপ্রিয়ার? রবিবার। অফিস ছিল না! সারাদিন নীলাম্বর কেবল লিখছিল আর ছিঁড়ছিল। সুপ্রিয়া সংসারী কাজকর্ম করল, একটা মাসিকের পাতা উল্টাল, বীরেনবাবুদের বাসায় গিয়ে গল্প ক'রে এল কিছুক্ষণ, সারল দৈনন্দিন সান্ধ্য প্রসাধন, তখনও নীলাম্বর কেবল লিখছে আর কাটছে। সুপ্রিয়া গিয়ে কাছে দাঁড়িয়েছিল, বলেছিল, এই, যাও এখন ঘুরে এস একটু নদীপার দিয়ে, এত যদি কাটছ তবে লিখছ কি, সব সময়েই কি লেখা যায়?
নীলাম্বর বিদ্যুৎস্পৃষ্টের মত চেয়ার ছেড়ে উঠে পড়েছিল, তার সমস্ত মুখে পশুর হিংস্রতা, ঠিক সুপ্রিয়ার গলার ব্যঙ্গাত্মক অনুকরণ ক'রে বলেছিল, এই যাও বীরেনবাবুর বাসা থেকে একটু ঘুরে এস না, সব সময়েই কি এখানে আসতে হয়?
সুপ্রিয়া নীরবে বেরিয়ে এসেছিল।
লেখক হলেই কি অভদ্র হতে হবে, স্বামী হলেই কি ইতর হতে হবে? আর এমন শুধু আজই যে প্রথম তা নয়, এমন প্রায় প্রত্যেক দিন।

সুপ্রিয়ার যেন আলাদা কোনো জীবন নেই, অস্তিত্ব নেই, নেই তার নিজের ভালোলাগা না-লাগা। (সে শুধু নীলাম্বরের মনের বিভিন্ন অবস্থার বহিঃপ্রকাশ মাত্র। নীলাম্বর অন্তত তাই চায়। যখন ভালোলাগে নীলাম্বরের, ভালো কোনো আইডিয়া আসে মাথায়, তখন নীলাম্বরের উচ্ছ্বাসের বন্যায় তাকে ভেসে যেতে হবে, হাসতে হবে, গান গাইতে হবে। আর নীলাম্বর যখন লিখতে পারবে না, যখন লেখা কাগজ টুকরো টুকরো ক'রে ছিঁড়ে ফেলতে থাকবে, তখন সুপ্রিয়া কেন দেয়ালে মাথা ঠুকে ঠুকে রক্তাক্ত হতে থাকবে না, আত্মহত্যা ক'রে মরবে না কেন?
প্রথম প্রথম হেসেছে সুপ্রিয়া, পাগলামি ভেবে প্রশ্রয় দিয়েছে। কিন্তু এতো পাগলামি নয়, যদিও কলম নিয়ে বসলেই পাগল সাজবার কারো অধিকার থাকে না। নীলাম্বরের এ পাগলামি নয়, হীন স্বার্থপরতা। নীলাম্বর চেনে শুধু নিজেকে, নিজেকেই সে একমাত্র ভালোবাসে।

নীলাম্বর ফিরে এল তার লিখবার ঘরে। নতুন লেখাটা নিয়ে প্রথম দিক থেকে চেষ্টা করল একটু পড়তে। কিন্তু কিছুক্ষণ আগেও যেমন ভালো লেগেছিল তেমন আর লাগল না। নীলাম্বর জানত এমনই হবে, এমনই হয়। কাল আরো খারাপ লাগবে, পরশু আরো। নীলাম্বর টেবিলের এক ধারে ঠেলে রাখল লেখাটা। তার সারাদিনের পরিশ্রমের ফল।
কি ঝগড়াটে মেয়েই হয়েছে সুপ্রিয়া। এই সাত আট বছর পরেও সেই গেঁয়ো স্বভাব তার রয়েই গেছে; বদলেছে কেবল তার বাইরেটা। নীলাম্বরের সাহচর্য শুধু কি তার বাইরের ঔজ্জ্বল্যই বাড়িয়েছে? অন্তরকে সমৃদ্ধ করেনি? সুপ্রিয়া শিখেছে সাজসজ্জা; আর সূক্ষ্ম শিল্পের

মতই কথার সে অনুশীলন করেছে—ঠিক তার প্রসাধনের মত। এর চেয়ে তার সেই গেঁয়ো ভাষায় ঝগড়াও যেন ভালো ছিল। এমন তীক্ষ্ন বাঁকা ফলকের মত শ্লেষ সে কোথায় শিখল, কোথায় পেল এমন ব্যঙ্গের বিষাক্ত ভঙ্গি।

একি নীলাম্বরের নিজেরই শিক্ষা? তার কথা থেকে, তার লেখা থেকেই কি এসব সংগ্রহ করেছে সুপ্রিয়া? তার লেখার মতই কি সে ব্যর্থ নিষ্ফল, ভাবহীন, প্রাণহীন শুধু ভঙ্গিসর্বস্ব ভাষা? নীলাম্বর তার আত্মপীড়নে ফিরে এসেছে! একি সুপ্রিয়ার দোষ নয়, সুপ্রিয়াই নয়, নীলাম্বরেরই বিকৃত প্রতিধ্বনি। সবাই ভাবে, সুপ্রিয়াও ভাবে, নীলাম্বর দাম্ভিক স্বার্থপর, সে শুধু নিজেকে ভালোবাসে। কিন্তু ঠিক নিজেকে নয়, নীলাম্বর ভালোবাসে নিজেকে টুকরো টুকরো করতে।

আরও কিছুক্ষণ পরে সুপ্রিয়া এসে দাঁড়াল, রাত আর বেশি নেই, চল শোবে।

বেশ একটু বেলাতেই নীলাম্বরের ঘুম ভাঙল। চোখ মেলে দেখল সুপ্রিয়া কখন উঠে গেছে। নীলাম্বর আবার চোখ বুজল, কিন্তু বেশিক্ষণ এভাবে চোখ বুজে থাকা যায় না, জানালা দিয়ে রোদ এসে গায়ে পড়েছে। হাত বাড়িয়ে জানালার একটা পাট ঠেলে দিতে যাচ্ছে, সুপ্রিয়া এসে ঘরে ঢুকল। স্নান সেরে চা ক'রে এনেছে রান্নাঘর থেকে, আর একটা প্লেটে কতকগুলি সাদা ফুল। মুচকি হেসে বলল, কবিরা ফুল ভালবাসে'

নীলাম্বর চাযে চুমুক দিয়ে বলল, ফুল খেতে ভালবাসে না তা বলে।

জানো না, অনেক ফুলই খাওয়া যায়, এমন কি তোমাদের এই কচুরি ফুলেরও বড়া খেতে মন্দ লাগে না। কোনো জিনিসই অকেজো নয় একেবারে। দেখেছ কচুরির গাটনা অনেক পাতলা হয়ে গেছে, আজ

ওপার বেড়াতে যাবে। ক'দিন্ ধরে শ্যামলবাবু আর বীরেনবাবুর বউয়ের মুখ দেখেই কাটল।

নীলাম্বর বলল, কেন শ্যামলবাবু আর বীরেনবাবুর বউয়ের মুখ মন্দ কি ?

কপট ঈর্ষার ভঙ্গিতে সুপ্রিয়া বলল, হুঁ তাতো বলবেই। পরের বউয়ের মুখ কেউ মন্দ দেখে না, বিশেষ ক'রে সাহিত্যিকরা।

নীলাম্বর বলল, দেখ, পরের বউয়ের মুখের দিকে চাওয়া যদি এক আধটু অভ্যাস করতাম, তা হলে তোমার কাছে এমন সুলভ হতাম না, একটু মান থাকত।

খবরদার অমন কাজও কোরো না তা হলে আর মুখ দেখাবার জো থাকবে না।

মুখ দেখানটা দরকার। এই সামাজিক চেতনা সুপ্রিয়ার প্রথম থেকে। তখনকার একদিনের কথা নীলাম্বরের মনে পড়ছে। নীলাম্বর একটা কবিতা লিখেছিল। তার ভাবটা ছিল : তোমার চুল খুলে দাও, সেই চুলের আড়ালে ঢেকে রাখব আমার মুখ, লুকিয়ে রাখব নিজেকে সমস্ত পৃথিবী থেকে।

সুপ্রিয়া হেসে উঠেছিল, ও বাবা অত চুল পাব কোথায়। আর তা হলে কি লোকের কাছে মুখ দেখাবার জো থাকবে, বদনাম রটবে দুজনেরই।

কাকে মুখ দেখাতে চায় সুপ্রিয়া ? শুধু নীলাম্বরকে বুঝি নয়। সুপ্রিয়ার ঘোমটার আড়ালে শুধু কি দেখবার আর দেখাবার লুব্ধতা ?

কিন্তু নীলাম্বর তো তা চায় না, সে দেখাতে চায় না নিজেকে, সারাজীবন সে কেবল পালিয়ে বেড়াচ্ছে, মানুষের কাছ থেকে কেবল লুকোতে চেয়েছে, পৃথিবীকে সে ভয় করে, ভয় করে মানুষের দৃষ্টিকে। আর সমস্ত পৃথিবীময় কেবল অসংখ্য মানুষ যারা কিলবিল করছে পোকার মত, মশকের মত দুঃসহ গুঞ্জন তুলছে।

আট ন'ঘণ্টা অফিসের ক্লান্তি। সারাদিন কাগজপত্রের ফাইল সামনে ক'রে ঝুঁকে থাকতে হোলো নীলাম্বরকে। অবশেষে সন্ধ্যার দিকে মুক্তি। কিন্তু বাসায় ফিরে এসে নীলাম্বর দেখল সুপ্রিয়া এখনও ফেরেনি। ক'দিন পরে সে ছাড়া পেয়েছে। মনের সাধ মিটিয়ে গল্প করবে, গল্প করতে পারলে মেয়েরা আর কিছু চায় না। চাকর শম্ভু বসে বসে বিড়ি টানছিল, নীলাম্বরকে দেখে তাড়াতাড়ি বিড়িটা আঙুলের আড়াল ক'রে বলল, আপনার খাবার ঢেকে রেখে গেছেন মা।

নীলাম্বর বলল, কৃতার্থ করেছেন।

তবু খবর যেটুকু আছে শম্ভু জানাবেই, বীরেনবাবুর বাসার সঙ্গে থানার বড়বাবুর বাসায় গেছেন বেড়াতে, ফিরতে একটু দেরি হলে—

নীলাম্বর বলল, আমাকে রান্না চড়াতে বলে গেছেন বুঝি।

শম্ভু বলল, না বাবু।

আচ্ছা তুই যা।

একটু পরে শ্যামলবাবু এলেন তাঁর বাসা থেকে। নীলাম্বর বলল, কি খবর?

চায়ের নেমন্তন্ন ক'রে পাঠিয়েছে আমার স্ত্রী। এত কাছে আছেন অথচ আলাপ নেই। আপনিও যেমন লাজুক, সেও তেমনি, কিন্তু আপনাকে সে চেনে, আপনার লেখা খুব পড়েছে, খুব নাকি ভালো লাগে তার।

তাই নাকি? তবে তো আমারই তাঁকে চা খাইয়ে দেওয়া দরকার।

শ্যামলবাবু বললেন, কি যে বলেন, আমার অবশ্য গল্পটল্প ততো ভালো লাগে না, পরে একটু লজ্জিত হয়ে বললেন, মানে শুধু আপনার বলে নয়—

নীলাম্বর সপ্রতিভভাবে বলল, তাতে কি? গল্প তো শুধু ছেলেমানুষ আর মেয়েমানুষের জন্যই।

সুপ্রিয়া এল সন্ধ্যার পর, কথায় কথায় একটু দেরি হয়ে গেল। রাগ করনি তো।

নীলাম্বর একটু তাকাল সুপ্রিয়ার দিকে। দেরি হওয়ার জন্য কিছু মাত্র অনুশোচনা নেই। এ ছদ্ম সৌজন্য কেন। সমস্ত মুখ সুপ্রিয়ার আনন্দে ঝলমল করছে। সে যেন সম্পূর্ণ নতুন জীবন লাভ করেছে। ক'দিন সে শুকিয়ে ছিল, আজ এই সন্ধ্যায় সে নতুন ক'রে ফুটে উঠেছে, নিজের সৌরভে নিজেই সে আমোদিত। নীলাম্বরকে তার না হলেও চলে। বরং নীলাম্বরের কাছেই সে নিষ্প্রাণ, শুষ্ক দুঃসহ।

নীলাম্বর বলল, না রাগ করব কেন ?

নীলাম্বর লক্ষ্য করল সুপ্রিয়া কেবলই হাসি চাপবার চেষ্টা করছে।

কি ব্যাপার হাসছ কেন ?

না অমনিই। হেমাঙ্গবাবুর ক্যারিকেচার মনে পড়ছে।

হেমাঙ্গবাবু আবার কে ?

পারুলের দাদা। ভারি চমৎকার লোক। দিল্লীতে পাঁচশ টাকা মাইনে পান। এখানে ছুটিতে বেড়াতে এসেছেন বোনকে দেখতে, অবশ্য বোনকে দেখতে শুধু নয়, রমলা এসেছে খবর পেয়েছেন কিনা।

রমলা আবার কে এল ?

পারুলের কি রকম ননদ, বি এ পাশ করেছে এবার, বেশ সুন্দরী মেয়ে, ওই যে সুশান্ত সেন, উপন্যাস লিখে যিনি খুব নাম করেছেন তাঁরই বোন।

পৃথিবীর সমস্ত ভীড়কে সঙ্গে ক'রে নিয়ে এসেছে সুপ্রিয়া। সুশান্ত সেনকে ছেড়ে সুপ্রিয়া নিজেই আবার হেমাঙ্গবাবুতে এসে পড়ল, বেশ সুপুরুষ হেমাঙ্গবাবু আর এত আমুদে লোক, দারুণ গল্প করতে পারেন। সব রকমের গুণ আছে ভদ্রলোকের, গান বাজনার চর্চাও আরম্ভ করেছেন দিল্লীতে। দু-একবার অনুরোধ করতে গানও শোনালেন একখানা।

নীলাম্বর বলল, থামলে কেন, হেমাঙ্গবাবুর গুণবত্তার বর্ণনা শেষ হয়ে গেল এরই মধ্যে ?
সুপ্রিয়া হঠাৎ যেন থমকে গেল। স্থির দৃষ্টিতে তাকাল নীলাম্বরের মুখের দিকে, বলল, ও আমারই ভুল, পরমুহূর্তে চোখ রগড়ে দেখলাম আমারই ভুল হয়েছে। তাইতো আমার তো এসব দেখবার কথা নয়। দেখলাম হেমাঙ্গ নামে একটা ছোঁড়া একখানা পা তার খোঁড়া, পাঁচ টাকা মাইনেয় কোথায় চাকর খাটে আর রমলা নামে টাক পড়া এক বুড়ি। খুব ঝগড়া হচ্ছে তাদের মধ্যে, দাম্পত্য কলহ।
নীলাম্বরের তীক্ষ্ণ দৃষ্টি বিদ্যুতের মত ঝলসে উঠল সুপ্রিয়ার চোখের উপর। তারা সব জানে, পরস্পরকে তাদের আর চিনতে বাকি নেই। কতদিন তারা নিজেকে নিঃসংকোচে অনাবৃত করেছে পরস্পরের কাছে। তাই কি পরস্পরের খুঁত তারা এমন নিখুঁতভাবে চিনেছে, তাই কি আবরণ ভেদ ক'রে তাদের দৃষ্টি শুধু ক্ষতস্থানে গিয়েই বিদ্ধ হয় ? দুই ধারাল তরবারির মত তাদের মিল কি শুধু আঘাতে আঘাতে ?
নিঃশব্দে সুপ্রিয়া বেরিয়ে এল ঘর থেকে, সমস্ত অন্তর তার বেদনায় ক্লিষ্ট হয়ে উঠেছে। সারাজীবন কি এমনি করেই কাটবে ? পৃথিবীর কোনো সার্থকতার কথা, কোনো ঐশ্বর্যের কথা ভুলেও নীলাম্বরকে শোনান যাবে না, নীলাম্বর তাতে ব্যথা পায়, তার অসার্থকতাকে তা ব্যঙ্গ করে। নীলাম্বর একদিন বলেছিল, তুমি আমার সমস্ত পৃথিবী, আমি লুকিয়ে থাকতে চাই তোমার মধ্যে। কিন্তু লুকাবার জন্যে তো পৃথিবীর প্রয়োজন নেই, প্রয়োজন শুধু গহ্বরের। সংকীর্ণ কুৎসিত গহ্বর নিঃশ্বাসে যা বিষাক্ত হয়ে উঠে। পৃথিবীর ঐশ্বর্য সুপ্রিয়ার মধ্যে নেই, কিন্তু তার উপভোগের আনন্দও কি নীলাম্বরের সহ্য হবে না ? সে কি শুধু খুঁড়ে খুঁড়ে গহ্বর তৈরি করবে ? নীলাম্বরের সমস্ত সাহিত্যচর্চাও কি তাই ? সেও শুধু

তার নিজেকে ঢাকবার নিজেকে লুকাবার গুহা মাত্র। এইজন্যই কি সেখানেও সে স্বস্তি পাচ্ছে না; কেবল নিজেরই প্রতিবিম্ব দেখতে পাচ্ছে? নদী পরিষ্কার হয়ে গেছে আজ। স্বচ্ছ স্ফটিকের মত জল। নিচে তারা ভরা আর এক আকাশ স্পন্দিত হচ্ছে। ওপরের দিকে চাইতে সুপ্রিয়ার ইচ্ছা করেছে না, আকাশের চেয়ে আকাশের এই ছায়া যেন আরো সুন্দর।

ওপার থেকে জয়ঢাক আর কাড়ার কর্ণভেদী আওয়াজ ভেসে আসছে। আর হল্লার শব্দ! কোত্থেকে এক সার্কাসের দল এসেছে, ছোট্ট শহর তাতেই তরঙ্গায়িত হয়ে উঠেছে। আশেপাশের গ্রাম থেকে কেবলই ভেঙ্গে পড়ছে জনতা। আনন্দ কত সহজ, কত সুলভ, যেখানে সেখানে ছড়ান রয়েছে শুধু কুড়িয়ে নিলেই হয়। কাল ওদের স্পেশাল শো। থানার স্টাফ সব যাবে। হেমাঙ্গ আর রমলা তাকে বিশেষভাবে আমন্ত্রণ ক'রে রেখেছিল।

হেমাঙ্গ আর রমলা। কি সুন্দর, কি চমৎকার তাদের জীবন। সমস্ত পৃথিবী যেন শুধু তাদের জন্যই। কউকে তারা বাদ দিতে চায় না, কিছুই ছাড়তে চায় না, সমস্ত কিছু যেন তাদেরই অলংকার—তাদেরই অহংকার। এক ঘর লোকের মধ্যেই হেমাঙ্গ আর রমলা যেন পরস্পরকে বেশি উপভোগ করছিল। ভীড় তারা ভালবাসে, ভীড় থেকে নয়, ভীড়ের মধ্যেই তারা লুকাতে চায়। হেমাঙ্গ আর রমলা। বেশি কথা তাদের দরকার হয় না। শুধু আভাস আর ইঙ্গিতই তাদের যথেষ্ট।

আর আজকাল বেশি কথা নীলাম্বর সুপ্রিয়ারও প্রয়োজন হয় না। শুধু আভাস আর ইঙ্গিত তাদেরও যথেষ্ট।

সহসা সমস্ত মন সুপ্রিয়ার বেদনায় অভিভূত হয়ে গেল। রাগ নয়, নীলাম্বরের ওপর করুণ সহানুভূতিতে আর্দ্র হয়ে উঠল মন। অনুকম্পা

হতে লাগল। আঘাত নয় আর, কলহের শেষ হোক। ঈর্ষার দহন থেকে সে তাকে স্নিগ্ধ শ্যামল পৃথিবীর মাঝখানে নিয়ে আসবে, শিল্পসৃষ্টির মধ্যেও নিজের পঙ্গুতাকেই যদি নীলাম্বর শুধু প্রত্যক্ষ করতে থাকে, সেখানেও শুধু যদি ঈর্ষা আর প্রতিযোগিতা তাকে দগ্ধ করতে থাকে, সেই গুহা নীলাম্বর ছেড়ে আসুক। জীবনের আরো অনেক দিক আছে, জীবন আরো বড়, আরো বিচিত্র। সুপ্রিয়া নীলাম্বরের পৃথিবী হতে চায় না, এই বিপুল পৃথিবীর মাঝখানে পাশাপাশি দাঁড়িয়ে নীলাম্বরের সঙ্গেই সমস্ত পৃথিবীকে সে উপভোগ করতে চায়।

কিন্তু লিখবার ঘরের ঠিক সামনে এসে সুপ্রিয়া থমকে দাঁড়াল। সমস্ত ঘর ভরে অস্থিরভাবে পায়চারি করছে নীলাম্বর। তার চোখে সন্ধ্যাবেলার সেই হিংস্রতা, এ ঘরের জানালা দিয়েও সেই তারায় ভরা আকাশ দেখা যাচ্ছে। পূব দিকে গোল হয়ে এতক্ষণে চাঁদ উঠে এসেছে আকাশে। আয়নার মত নদীর স্থির স্বচ্ছ জল টল টল করছে। জ্যোৎস্নার অজস্র প্লাবনে ছোট্ট শহর নিজেকে মেলে ধরেছে। কিন্তু নীলাম্বরের চোখে বিস্ময় নেই, মুগ্ধতা নেই, সে আজো লিখছে। সহসা কালকের রচনাটাকে নীলাম্বর নির্মমভাবে টুকরো টুকরো ক'রে ছিঁড়ে ফেলল। তৃপ্তি নেই, সন্তুষ্টি নেই কিছুতে। কয়েকখানা সাদা পাতা টেনে আবার সে লিখতে আরম্ভ করেছে। অমন সুন্দর আর এক পৃথিবী সৃষ্টি না করা পর্যন্ত সে থামবে না।

সুপ্রিয়া দোরগোড়াতেই দাঁড়িয়ে রইল।

একটু একটু ক'রে ভুবনবাবুর সেবা আর পরিচর্যার ভার সুব্রতের হাতে এসে পড়ল। দুর্ঘটনাটাকে কেউ তখনো স্বাভাবিকভাবে গ্রহণ করতে পারেননি। ভুবনবাবুর বৃদ্ধা মা শুধু কাঁদছেন, হিমানী লুকিয়ে লুকিয়ে বেড়াচ্ছেন, কিছু করতে বললে বলছেন, আমাকে কিছু বোলো না সুব্রত। আমি আর সব করতে পারব, কিন্তু ওঁর ওরকম অসহায় দৃষ্টি সহ্য করতে পারব না।

সুব্রত সান্ত্বনা দিয়ে বলে, কিন্তু আপনাকেই তো সহ্য করতে হবে মামীমা। এর চেয়ে বেশি যে সুব্রত কি বলতে পারে তা সে ভেবে পায় না।

অমূল্য আরো বেশি নার্ভাস এবং সব বিষয়েই অপটু। বিশেষ ক'রে এই দুর্ঘটনায় সে এত বিহ্বল হয়ে পড়েছে যে তাকে প্রকৃতিস্থ করতেই আর একজনের প্রয়োজন। চিকিৎসকের অসাবধানতার জন্যই হোক বা যেমন করেই হোক কথাটা প্রকাশ হয়ে গেছে, ভুবনবাবু দক্ষিণ অঙ্গ যে তুলতে পারছেন না—এটা পক্ষাঘাতের লক্ষণ। জীবনে এটা আর নিরাময় নাও হতে পারে।

শুশ্রূষা পরিচর্যায় আবাল্য সুব্রতের অভ্যাস আছে। সুনিপুণ তৎপরতায় এ সব সে করত পারে, কিন্তু প্রবোধ সান্ত্বনা দিতে হলে সে বড় অস্বাচ্ছন্দ্য বোধ করে। বিশেষত এঁদের নিজেরই যখন আশ্বস্ত

হওয়া উচিত। চিকিৎসা সবে আরম্ভ হোলো। অর্থব্যয়ের সাধ্যও এঁদের আছে। কিছুদিন ভুবনবাবু শয্যাশায়ী হয়ে থাকলে সংসার অচল হবে তাও নয়। বলতে গেলে কলেজ তো তাঁর নিজের হাতেই গড়া। কর্তৃপক্ষ উপযুক্ত বিবেচনাই ভুবনবাবুর সম্বন্ধে করবেন।

কিন্তু পরমুহূর্তে নিজের রূঢ় মনোভাবে সুব্রত লজ্জিত বোধ করে। হৃদয়ের কোমলবৃত্তি বোধ হয় কিছু তার নেই। মায়ের স্নেহ, স্ত্রীর ব্যাকুলতা অনুভব করবার শক্তি তার নেই বলেই সে তাদের এমন বিপদের দিনে এত চুলচেরা হিসাব করতে পারছে। ফলে, এই অবিচারের শাস্তিস্বরূপ সুব্রত রোগীর সমস্ত দায়িত্ব নিজের ওপর তুলে নিল। কয়েক-দিন পরে ভুবনবাবুর মা প্রবোধ মনলেন, হিমানীকেও সমস্ত সহ্য ক'রে অত্যাবশ্যক গৃহকর্মে মন দিতে হোলো। কিন্তু পরিচর্যার ভার রইল সুব্রতের নিজের হাতেই। হিমানী কি অমূল্য যে মাঝে মাঝে শুশ্রূষা না করতে আসেন তা নয়, কিন্তু ভুবনবাবুর কিছু মনঃপূত হয় না। এ সবকাজে কোনো ত্রুটি সুব্রতও সহ্য করতে পারে না, হোক তা অপটুতাজনিত। রোগীর অসুবিধা অস্বাচ্ছন্দ্য তাতে তো আর কমে না। রোগী নিজেই অসহায়, আর কারো অসহায়তা সহ্য করবার শক্তিতার নেই।

সকলেই দেখা করতে আসেন। কলেজের সহকর্মীরা ছাড়াও ভুবনবাবুর বন্ধুবান্ধব প্রচুর। পাণ্ডিত্য তাকে আত্মকেন্দ্রিক করেনি; ববং বেশি মাত্রায় তিনি সামাজিক। সমাজের সকল স্তরের লোকের সঙ্গে তাঁর আলাপ। এত বই আর এত মানুষের সঙ্গে এক জীবনে এত ঘনিষ্ঠ পরিচয় কি ক'রে করে উঠতে পারলেন তাই আশ্চর্য। তাঁর দাক্ষিণ্যে যাঁরা কৃতজ্ঞ তাঁদের ভীড়ও কম হয় না। বিশেষ ক'রে ছাত্রছাত্রীর দল। কতজনে তাঁর বাড়িতে থেকেই মানুষ হয়েছে, বই দিয়ে, অর্থ দিয়ে, বিনা বেতনে কি অর্ধ-বেতনে পড়বার সুযোগ দিয়ে কতজনকে তিনি

কতভাবে সাহায্য করেছেন। সবাই দেখা করতে চায়, কৃতজ্ঞতা সহানুভূতি জানাতে চায়। ভুবনবাবু ভিতরে ভিতরে ক্লান্তি বোধ করেন। কিন্তু তা প্রকাশ হতে দেন না। সবার সঙ্গেই হেসে দু'একটা কথা বলেন। উল্টে এদেরই ভরসা দেন। এরা এত ভয় পাচ্ছে কেন। কি আর এমন তাঁর হয়েছে। দু'দিনেই তিনি সেরে উঠবেন। আবার ক্লাসে আর খেলার মাঠে তাদের সঙ্গে গিয়ে যোগ দেবেন। তাঁর জন্য কোনো দুশ্চিন্তা যদি তারা করে তা হলেই বরং তিনি বেশি অস্বস্তি বোধ করবেন।

কিন্তু তাঁর ভয় আর আশঙ্কা, তাঁর অসহায়তা সুব্রতের কাছে গোপন থাকে না। গোপন করতে তিনি চানও না, সমস্ত দৌর্বল্য প্রকাশ ক'রে তিনি সুব্রতের ওপর নির্ভর করতে চান। বলেন, আজকাল দুর্বল হতেই ভালো লাগে সুব্রত। এতদিন সকলের নির্ভরযোগ্য হতে পেরে আত্মপ্রসাদ লাভ করেছি, আজ দেখছি কারো ওপর নির্ভর করবার আরামও কম নয়। আমি খুব স্বার্থপরের মত কথা বলছি বুঝি সুব্রত ?

সুব্রতের কাছে ভুবনবাবু আদর্শস্থানীয়। তাঁকে সামনে রেখে সুব্রত নিজের জীবন গঠন ক'রে চলেছে। তাঁর জীবনেব ইতিহাস জয়েব ইতিহাস, সার্থকতার গৌরবে উজ্জ্বল। নিজের জীবনকে তিনি নিজের হাতে গঠন করেছেন। দৃঢ় অধ্যবসায়ে সমস্ত প্রতিকূলতা তিনি অতিক্রম করেছেন। কোনো মোহ কোনো বিভ্রম তাঁকে নিজের আদর্শ থেকে বিচ্যুত করতে পারেনি। আজ অসুস্থ হলেও তাঁর এই মানসিক বৈকল্যে সুব্রত ক্ষুব্ধ না হয়ে পারে না। তবু এ নিতান্তই আকস্মিক পীড়ার জন্য, এ বিহ্বলতা যে নিতান্তই সময়িক তাও সুব্রত মনে মনে জানে।

ভীড় শুভাকাঙ্ক্ষী ও কৃতজ্ঞদের হলেও তা চিকিৎসকদের পরামর্শে

অবিলম্বে ভেঙে দিতে হোলো। তাতে রোগীর বিশ্রামের ব্যাঘাত হওয়ার আরো বেশি আশঙ্কা। এখন ভীড় রইল শুধু চিকিৎসকদের। শহরের বড় বড় ডাক্তারদের জড়ো করা হোলো। কিন্তু কেউ তেমন ভরসা দিতে পারলেন না।

একদিন সকালে সুব্রত কি একটা কবিরাজী মালিস লাগাচ্ছে ভুবনবাবুর পায়ে, আস্তে আস্তে বাড়ির দরজার কড়া নড়তে লাগল। ঠাকুর চাকর কে কোথায় কাজে ব্যস্ত, অমূল্যও হয়তো কোথাও বেরিয়ে গিয়ে থাকবে। বাধ্য হয়ে সুব্রতকেই নেমে আসতে হোলো নিচে। দোর খোলাই ছিল। সিঁড়ির গোড়াতে এসে অবন্তীকে দেখা গেল। সুব্রতকে দেখে সেও কড়া নাড়া বন্ধ ক'রে হাসিমুখে অপেক্ষা করছে।

সুব্রতই আগে কথা বলল, আপনি !

সুব্রতের তৈলাক্ত দু'হাতে কটু মালিসের গন্ধ। সেদিকে একটু তাকিয়ে অবন্তী বলল, হ্যাঁ, আপনি কি বিস্মিত হচ্ছেন ?

সুব্রত অপ্রতিভভাবে বললে, না না, আপনারা এখানে ছিলেন না শুনেছিলাম।

অবন্তী হেসে বল্‌লে, ঠিকই শুনেছিলেন। কালই আমরা শিলং থেকে এসে পৌছেচি। এসে শুনলাম ওঁর খুব অসুখ। কি ব্যাপার বলুন তো। চলুন দেখেই আসি। একটু ইতস্তত ক'রে অবন্তী বলল।

অবন্তী যেন অনুগ্রহ করছে। সুব্রত ভাবল বলে, থাক না, দেখাসাক্ষাৎ করা এখন ডাক্তারদের নিষেধ আছে। কিন্তু বলতে হোলো; আচ্ছা চলুন।

লঘু পায়ে অবন্তী তরতর্‌ ক'রে সিঁড়ি বেয়ে উঠতে লাগল—যেন কোনো রোগীকে সে দেখতে যাচ্ছে না, মজা দেখতে যাচ্ছে।

ভুবনবাবু ইজিচেয়ারের ওপর দু'পা টান ক'রে রয়েছেন, সুব্রত যেমন ভাবে রেখে গিয়েছিল। শুধু যে বইখানা বন্ধ ক'রে তিনি কোলের ওপর রেখে দিয়েছিলেন, সেখানা আবার খুলে নিয়েছেন। সুব্রতরা ঘরে ঢুকতেই সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে তার দিকে তাকালেন।

সুব্রত আড়াল ছেড়ে একটু সরে দাঁড়িয়ে বলল, আমাদের সঙ্গে পড়েন।

ভুবনবাবু হেসে বললেন, চিনেছি, ইউনিভার্সিটিতে তো প্রায়ই দেখা হয়। ইউনিভার্সিটিতে তাঁর দুটো ক্লাস আছে সপ্তাহে।

অবন্তী বলল, হ্যাঁ নামটা আছে ওখানে!

শুধু নামই বা থাকবে কেন? চেয়ার দেখিয়ে দিয়ে ভুবনবাবু বললেন, বোসো। তোমার নাম অবশ্য অন্যত্রও শুনেছি।

মুহূর্তের জন্য অবন্তীর চোখে একটু শঙ্কার ছায়া পড়ল। কিন্তু পর-মুহূর্তেই অত্যন্ত সপ্রতিভভাবে তরলকণ্ঠে বলল, দুর্নাম নিশ্চয়ই।

সুব্রত একটু বিস্মিত হোলো, ভুবনবাবুও। ক্লাসে তিনি অত্যন্ত বাশ-ভারী লোক। তাঁর কঠোরতা সকলেই জানে। কেউ কোনোরকম চাপল্য প্রকাশ করতে সাহসী হয় না তাঁর সামনে। কিন্তু মেয়েটির এই স্পর্ধায় ভুবনবাবু তেমন ক্ষুণ্ণ হলেন না, বরং আজ একটু প্রশ্রয় দিতেই যেন ভালো লাগল। মৃদু হেসে বললেন, কি জানি, দুর্নাম কি সুনাম ভুলে গেছি।

অবন্তী বলল, বাঁচলুম। ভুলে যাবার এমন মহৎ অভ্যাস খুব কম লোকেরই থাকে, না সুব্রতবাবু?

ভুবনবাবু বললেন, কিন্তু তোমার নাম তো এখনো বললে না।

বলে কি লাভ, কোনো নামই যখন আপনার মনে থাকে না।

এমন লঘু তারল্য ভুবনবাবু যেন আর কোনোদিন উপভোগ করেননি, মনে হোলো তাঁর জরা আর জড়তা যেন অর্ধেক কমে গেছে।

বললেন, ও সেজন্য ভেবো না, মনে করিয়ে দেওয়ার লোক এখানে থাকবে। বলে সুব্রতের দিকে একবার তাকালেন ভুবনবাবু। সুব্রতের সমস্ত মুখ তখন আরক্ত হয়ে উঠেছে। অবন্তীও সেদিকে চেয়ে দেখল। সুব্রতের এই মেয়েলি লজ্জা বেশ উপভোগ্য মনে হোলো তার কাছে। একটু চুপ ক'রে থেকে বলল, সে ভয় করবেন না, এখানে ভুলে যাওয়াটাই সংক্রামক দেখছি, নইলে সুব্রতবাবু আমার নাম জানতেন বলেই তো ধারণা ছিল।

আরো কিছুক্ষণ একথা ওকথার পর অবন্তী উঠে দাঁড়াল। বলে গেল এর পরেরদিন সে বই নিয়ে আসবে। ছুটিতে মোটেই পড়াশুনো করেনি। এখন আরম্ভ না করলে পাশই করতে পারবে না। অবশ্য ভুবনবাবু আর সুব্রতবাবু যদি সাহায্য করেন তবে আর কোনো ভাবনা নেই।

ভুবনবাবু লক্ষ্য করলেন তাঁর রোগশয্যার পাশে এই প্রথম একজন এল, যে একবারও তাঁর অসুখের কথা তাঁকে মনে করিয়ে দিল না, তিনি যেন সুস্থ স্বাভাবিক মানুষ এমনভাবেই আলাপ ক'রে গেল। এতে যেন তিনি একটু আনন্দই বোধ করলেন। বললেন, মেয়েটি একটু প্রগলভা বটে, কিন্তু কী সাহস।

সুব্রত তাঁর পায়ে আবার তেল মালিশ করতে আরম্ভ করেছিল, সংক্ষেপে জবাব দিল দুঃসাহস।

ভুবনবাবু হেসে বললেন, তুমি একটি দুর্মুখ।

তারপর থেকে অবন্তী মাঝে মাঝে আসে, বই খাতা নিয়ে আসে বলে তাদের বাড়ির সবাই ভাবে পড়তেই আসে, কিন্তু এবাড়ির সবাই জানে সে পড়তে আসে না, আসে গল্প করতে। কোনোদিন কারো রোগশয্যার ছায়াও সে মাড়ায়নি, কোনো আত্মীয়বন্ধুদেরও না। সেবা শুশ্রূষা সে

কোনোদিন করতে জানে না, জীবনের এই দিকটাকে সে কোনোদিন বুঝতে পারেনি, বুঝতে চেষ্টাও করেনি। প্রথমত সুব্রতের হাবভাব তার কাছে হাস্যকর মনে হয়েছে। মাথা মুড়ে শিখা রাখলেই যেন ওকে মানাত। যেন একখানা মূর্তিমান কঠোপনিষৎ। তারপর তার এই মেয়েলি সেবা। এতেও সুব্রতের ওপর প্রথমত তার বীতস্পৃহা এসেছে। সে শুনেছে সুব্রতকে ভুবনবাবুই মানুষ ক'রে তুলেছেন। নিজের বাড়িতে রেখে পড়াশুনোর সম্পূর্ণ সুযোগ তিনিই ক'রে দিয়েছেন। না হলে সুব্রতকে হয়তো নিরক্ষর হয়ে থাকতে হোতো। সম্পর্কে সুব্রত ভুবনবাবুর দূরসম্পর্কের এক ভাগিনেয়, কিন্তু এখন এমন নিকটতম আত্মীয় পরস্পরের আর কেউ নেই। তবু এই পরিচর্যার প্রণালীটা কিছুতেই অবন্তীর মনঃপূত হয়নি। পুরুষের কৃতজ্ঞতা এমন হবে কেন, তার কৃতজ্ঞতা প্রকাশের মধ্যেও পৌরুষ থাকবে। সে নিজে কেন এমন কপালে হাত বুলিয়ে দেবে, পা মালিশ করবে। অগাধ অর্থ উপার্জন করুক না সুব্রত, রেখে দিক চার পাঁচটা নার্স। আরো প্রচুর অর্থ ব্যয় করুক চিকিৎসার জন্য।

তবুও অবন্তীর সুব্রতকে কেন যেন ভালো লাগে। সুব্রতর মধ্যে কি যেন এক আকর্ষণের জিনিস আছে। অবন্তী নিজের মনে মনে জানে তা কী। সে সুব্রতর সৌন্দর্য। ওর দিকে চেয়ে থাকতে থাকতে অবন্তীর মনে হয়—সুব্রতকে সবই মানায়। যে সুন্দর, তার সংস্পর্শে যাই আসুক তাই তার অলংকার হয়ে ওঠে। ভুবনবাবুর পায়ে মালিশ করাটাও এখন ওর পক্ষে অশোভন মনে হয় না। সে যখন সংযমের কথা বলে, আধুনিক রীতিনীতির নিন্দা করতে থাকে—তখনো অবন্তীর তেমন ক্ষোভ হয় না। ও যাই বলুক—অদ্ভুত ওর কথা বলার ভঙ্গি। আর দেহের সৌন্দর্য তো শোনার জিনিস নয়, তা দেখবার, স্পর্শ করবার।

স্পর্শ সে করেছে সুব্রতকে—এ সম্বন্ধে অবন্তীর দৃঢ় বিশ্বাস আছে মনে। সুব্রতকে চমৎকার না লেগে পারে না। ও যাই হোক, যত পুরোনো আর পুরাণের কথাই বলুক না—ও নতুন ও সম্পূর্ণ নতুন। জীবন সম্বন্ধে কোনো অভিজ্ঞতাই ওর নেই। সামান্য কথায়, সামান্য ইঙ্গিতে, সামান্য স্পর্শে ও আরক্ত হয়ে ওঠে। ওর সংস্পর্শে এলে অবন্তীর মনে হয়, তারো যেন এই আরম্ভ। সমস্ত অভিজ্ঞতা যেন তার স্মৃতি থেকে ধুয়ে গেছে। একথা অবশ্য অবন্তীর আরো অনেকবার মনে হয়েছে। চমৎকার এই ভালোবাসা, ভোরের সূর্যের মত সুন্দর আর নতুন, পুনরাবৃত্তিতে যার কোনো ক্লান্তি নেই।

সুব্রত সুন্দর। তাই তো যথেষ্ট। মতের সঙ্গে নাই বা মিলল। কি হবে মত আর মন দিয়ে যতক্ষণ চোখ আছে। আলাদা জিনিস এই সৌন্দর্য, মতবাদের মাপকাঠি দিয়ে মাপবার জন্যে এতো নয়। কিন্তু সুব্রত কেন এত প্রচ্ছন্ন রাখে নিজেকে? ও কেন কথা বলে না? নাই বা বলল কথা! কথা তো অবন্তী অনেক শুনেছে, অনেক বলেছে। আজ মনে হয়, ভাষার চেয়ে আভাস অনেক ভালো। অনেক সুন্দর প্রকাশের চেয়ে অপ্রকাশ। প্রকাশ বড় সংকীর্ণ, সীমাবদ্ধ, অপ্রকাশের মধ্যে আছে বিচিত্র সম্ভাবনার ঐশ্বর্য।

কিন্তু সুব্রত কথা না বললে কি হবে, ভুবনবাবুকে কথার মোহে পেয়ে বসেছে। অবশ্য কথা বলতে ভুবনবাবু চিরকালই ওস্তাদ, ক্লাসে তাঁর বক্তৃতা খুব মনোজ্ঞ হোতো, বন্ধু মহলে যে কোনো বিষয় নিয়েই তিনি আলাপ করতেন, তাই উপভোগ্য হয়ে উঠত। অথচ তাতে তার স্বাভাবিক গাম্ভীর্য কিছুমাত্র শিথিল হোতো না। নিজেকে উপভোগ্য করবার জন্য লঘু তারল্যের আশ্রয় না নিলেও তাঁর চলত।

কিন্তু এখন ভুবনবাবু যেন বদলে যাচ্ছেন, কথাবার্তায় খানিকটা লঘুতা তিনি ইচ্ছা করেই আনেন। কথার তারল্যে নিজের জরাকে যেন ভাসিয়ে নিতে চান। নিজের শক্তির সীমা যেন তিনি জেনে ফেলেছেন। কথা, কথাই এখন তাঁর একমাত্র সম্বল। শুধু কথার মধ্যে দিয়েই নিজেকে তিনি উপভোগ্য করবেন, উপভোগ করবেন।

সেদিন আধুনিক প্রসাধনের সম্বন্ধে আলোচনা চলছিল। ভুবনবাবু বললেন দেখ, যত গোঁড়া আর যত বুড়োই হই তোমাদের সাজসজ্জা মনে মনে আমি পছন্দই করি। আর কিছু না হোক এ যুগে প্রসাধনের সাধনায় তোমরা সিদ্ধিলাভ করেছ। আজকালকার প্রসাধনে সেকালের ভারি অলংকার নেই, কিন্তু অহংকার আছে।

অবন্তীর প্রসাধনে সেদিন একটু বিশেষ পারিপাট্য ছিল। মূহূর্তের জন্য তার মুখে আরক্ত সলজ্জ আভাস ফুটে উঠল, কিন্তু পরের মূহূর্তেই তার স্বাভাবিক প্রগলভতার সঙ্গে বলল, এই স্বীকৃতিতে সমস্ত গোঁড়ামি আর বুড়োমির দুষ্কৃতি থেকে আপনি রেহাই পেলেন।

ভুবনবাবু বললেন, কিন্তু গোঁড়ামিকে যত সহজে ঝেড়ে ফেলা যায়, বুড়োমিকে তেমন পারা যায় না। তা দেহের সঙ্গে লেগে থাকে। তাঁর কণ্ঠস্বরে কেমন যেন একটু করুণ অসহায়তার সুর বেজে উঠল।

এক মুহূর্ত কেউ কোনো কথা বলল না। একটু চুপ ক'রে থেকে ভুবনবাবু নিজেই নিজের প্রতিবাদ করলেন, কিন্তু ওটা শুধু দেহের সঙ্গেই থাকে, মনের সঙ্গে নয়। মনের বয়স বাড়া মানে বার্ধক্য নয়, বৃদ্ধি। বার্ধক্য কথাটা বোধ হয় বৃদ্ধি থেকেই এসেছে। একেই বলে শাব্দিক পরিহাস।

কোনো কথা বলছ না যে অবন্তী?

শব্দতত্ত্বে স্তব্ধ হয়ে বসে আছি। অবন্তী একটু হাসল।

ভুবনবাবু যেন একটু ক্ষুণ্ণ হলেন, কিন্তু হার মানলেন না, শুধু শব্দতত্ত্ব কেন, কোনো তত্ত্বই তোমাদের ভালো লাগে না। তোমরা আজকাল বড় লঘুচেতা হয়ে গেছ। শুধু তথ্য খুঁজে বেড়াও, কি বল সুব্রত ?

সুব্রত বলল, নিশ্চয়ই—আমারও তাই মত।

সুব্রত আর কিছুই বলতে পারল না। অথচ ভুবনবাবুর সাথে তার মতৈক্যের কথা ছাড়া এ সম্বন্ধে আরো অনেক কিছু বলবার ছিল। সে এ সব সম্বন্ধে নতুন ক'রে ভেবেছে, নতুন পদ্ধতিতে সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বিশ্লেষণ ক'রে দেখেছে। এ যুগ নিজের অক্ষমতাকে ক্ষমতা বলে আত্মপ্রসাদ লাভ করে। সত্যকে মঙ্গলকে এ যুগ পুরোনো বলে অবজ্ঞা করে। কারণ, তাকে নতুন রূপ দেওয়ার সাধ্য তার নেই, নতুন ক'রে সৃষ্টি করার শক্তি তার লোপ পেয়েছে। কিন্তু সুব্রতের ভাষায় যা প্রকাশ পেল তা কত হাস্যকর; তা নিতান্ত ছেলেমানুষের মত হোলো। কথা বলতে সুব্রত কখনো পারে না। ছেলেবেলায় ভাষা ফুটতে তার অনেক সময় লেগেছিল। অনেকেই ভেবেছিল, সে বুঝি বোবাই হবে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত কথা বলতে যদি বা শিখল, বেশি কথা বলতে কিছুতেই শিখল না। অতি সংক্ষেপে নিজের প্রয়োজনকেই শুধু সে ভাষায় কোনো রকমে প্রকাশ করতে পারে, অপ্রয়োজনীয়তার আনন্দ সে উপভোগ করে শুধু চিন্তায়। মনে মনে কথা বলায় নিজের অক্ষমতার সঙ্গে সুব্রত প্রায়ই আপোষ ক'রে নিয়েছে। নিজের স্বভাবের সঙ্গে কতকাল আর লোক যুঝতে পারে। ভুবনবাবুর কথা বলবার শক্তিতে সুব্রত চমৎকৃত হয়, তার ঈর্ষা হয় না, হয় আনন্দ। সুব্রতের আদর্শ যেমন তাঁর মধ্যে রূপ পেয়েছে তেমনিই তার ভাষা ভুবনবাবুর কণ্ঠে। সব সময় তাঁর সব কথার সঙ্গে সুব্রতের অবশ্য মেলে না, কিন্তু তাঁর অনেক কথার মধ্যেই সুব্রত যেন নিজেকেই প্রকাশিত দেখতে পায়। বিশেষ ক'রে অবন্তীর সঙ্গে তাঁর এই কথোপকথন সুব্রতের বেশ উপভোগ্য লাগে।

অবশ্য মাঝে মাঝে মামার চপলতায় সুব্রত কিছু ক্ষুব্ধ হয়, একটু হয় তো লজ্জিতও বোধ করে, যেমন সে নিজের চাপল্যের জন্য করত। কিন্তু লজ্জা এবং ক্ষোভ ছাড়া এই লঘুতায় কোথায় যেন একটু লোভও আছে। বিশেষ ক'রে ভুবনবাবু যখন তার সম্বন্ধে ইঙ্গিত করেন। তাঁর এ ধারণার সূক্ষ্ম পরিহাসে বিরক্ত হওয়ার চেয়ে সুব্রত মনে মনে একটু আমোদই বোধ করে।

কিন্তু অবন্তী সুব্রতের মত নয়, অপ্রয়োজনীয় বহু কথা সে বলতে পারে, বহু কথা বলতে সে ভালোবাসে। একটু হেসে অবন্তী বলল, তাই নাকি? কিন্তু আমার তো মনে হয়, আপনি নিজের আসল মত লজ্জায় গোপন ক'রে যাচ্ছেন। তারপর ভুবনবাবুর দিকে চেয়ে বলল, কিন্তু তথ্য আর তত্ত্বের মধ্যে কোনো অহিনকুলের সম্বন্ধ আছে বলে আমার মনে হয় না। তথ্যের পথে আমরা তত্ত্বে পৌঁছি। কিন্তু আপনারা পথের কষ্ট স্বীকার করতে রাজি নন, তথ্যহীন কল্পনাতেই আপনাদের আনন্দ।

বিতর্ক কতক্ষণ চলত বলা যায় না। এই সময় হিমানী এলেন ঘরে। তাঁর দ্রুত নিঃশ্বাস পতনের শব্দ স্পষ্ট শোনা যায়। ওঠানামা করতে আজকাল একটু কষ্টই হয়। সিঁড়ি ভাঙ্গবার পক্ষে একটু যেন বেশিই মোটা হয়ে পড়েছেন হিমানী। একটু দম নিয়ে বললেন, এই যে অবন্তী, কেমন আছ, কখন এসেছ জানতেও পারিনি, নিচ থেকে ওপরের খোঁজ-খবর নিতে পারারও কথা নয়।

অবন্তী বলল, অন্তত ঘুমিয়ে থাকলে তো নয়ই, আপনার ঘরের সামনে দিয়ে আসতে আসতে দেখলাম, আপনি নাক ডেকে ঘুমাচ্ছেন।

হিমানী প্রতিবাদ করলেন, আমার কখনো নাক ডাকে না।

অবন্তী হেসে বলল, ডাকলেও তা আপনার শুনতে পাওয়ার কথা নয়।

বিরক্তির ভঙ্গিতে হিমানী মুখ ফেরালেন, সুব্রতকে জিজ্ঞাসা করলেন,

তারপর এবেলা পথ্যের কি ব্যবস্থা? উনি তো ওবেলা আমাকে শাসিয়েছেন—

সুব্রত নির্ম্ম এবং নিরপেক্ষ ভঙ্গিতে জবাব দেয়, উঁহুঁ, লুচি।

ভুবনবাবু কাতরভাবে বলেন, দোহাই তোমাদের আমি গরীবের ছেলে। ও সব বড়লোকের খাদ্য আমার মুখে রুচবে না প্রত্যেক দিন, আমার জন্যে দুটো ডাল ভাতেরই ব্যবস্থা করো।

সুব্রত বলল, কিন্তু আজ যে পূর্ণিমার রাত্রি সে কথা কি ভুলে গেছেন?

ভুবনবাবু বললেন, মনে রেখেই বা কি লাভ।

অবন্তী এবার উঠে দাঁড়ায়, চলুন সুব্রতবাবু একটু এগিয়ে দেবেন।

সুব্রত কিছু বলবার আগেই ভুবনবাবু বলে ওঠেন, নিশ্চয়ই, হ্যাঁ হ্যাঁ, যাও সুব্রত, এগিয়ে দিয়ে এসো। উৎসাহের আধিক্যে মনে হয়, ভুবনবাবু যেন নিজেই যাচ্ছেন।

ওরা চলে গেলে ভুবনবাবু বলেন, অবন্তীর সঙ্গে সুব্রতের বিয়ে হলে কেমন হয়!

তুমি অবাক করলে। ঐ ফাজিল মেয়েটার সঙ্গে? হিমানী বিরক্তির স্বরে জবাব দেন।

কিন্তু পড়াশুনোয় মেয়েটি খুব ভালো।

হিমানী এবার গম্ভীর হয়ে যান। পড়াশুনোওয়ালা মেয়ের ওপর ভুবনবাবুর চিরদিনের পক্ষপাতের কথা হিমানীর মনে পড়ে যায়। অথচ ভুবনবাবু কোনোদিন হিমানীর স্বল্পশিক্ষার জন্য প্রকাশ্যে কোনো ক্ষোভ করেননি, হিমানীকে কোনো অবহেলা অনাদর করেননি, বলতে গেলে দীর্ঘ দাম্পত্য জীবন তাঁদের সুখেই কেটেছে। কিন্তু মেয়েদের শিক্ষার যখনই প্রশংসা করেন ভুবনবাবু তখনই হিমানীর মনে যেন কেমন ক'রে ওঠে। ভুবনবাবুর গোপন ক্ষোভ যেন আর প্রচ্ছন্ন থাকে না। সমস্ত শিক্ষিতা

মেয়েদের ওপর হিমানীর ঈর্ষা হয়, রাগ হয়। মনে মনে স্বামীকেও তিনি ক্ষমা করতে পারেন না। তাঁর এই পক্ষপাতিত্ব, এই প্রচ্ছন্ন ক্ষোভ হিমানীর কাছে প্রায় বিশ্বাসঘাতকতার সামিলই মনে হয়।

কিছুক্ষণ পরে হিমানী চুপচাপ উঠে চলে যান। ছোট মেয়েটা খেতে বসে কি নিয়ে কোন্দল করছে, ভারি আবদারে হয়েছে মেয়েটা।

হিমানীর কালো, মোটা, মন্থরগতিতে অপসৃয়মাণ শরীরের দিকে চেয়ে থাকতে থাকতে হঠাৎ ভুবনবাবুর নিজেকে অত্যন্ত বঞ্চিত মনে হয়। তিনি যেন উপবাসী রয়ে গেছেন, বুভুক্ষু রয়ে গেছেন, যৌবনে যেন তিনি কোনোদিন কিছু উপভোগ করেননি। অলক্ষ্যে কখন প্রৌঢ়ত্ব এসে পড়েছে। আর সম্পূর্ণ বুড়ো হবার আগেই এল দুর্দৈবের পঙ্গুত্ব। এই রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শময় পৃথিবী তাঁর কাছে যেন অনাস্বাদিত রয়ে গেল। বিগত দীর্ঘ দাম্পত্যজীবনের দিনগুলির মধ্যে একটি উদ্বেল রঙীন মুহূর্তের কথাও আজ তাঁর মনে পড়ল না। বিশ বছর যেন একটানা কেবল একটা অভ্যাসের মধ্যে কেটেছে। নিতান্তই একটা শারীরিক অভ্যাস, আর কিছু নয়।

স্বখাত

অমৃতসরে চাকুরি উপলক্ষে মাস কয়েক প্রবাস জীবন কাটিয়ে এসে বন্ধু রমেনকে দেখে ভবতোষ অবাক্ হয়ে গেল। মুখে সেই প্রসন্ন হাসি নেই, মনে নেই আনন্দ। অবশ্য ইতিপূর্বে অন্য বন্ধুদের চিঠিপত্রে খবর কিছু কিছু সে পেয়েছিল। বাপের পাল্লায় পড়ে রমেনকে কালো এবং নিরক্ষরাপ্রায় মেয়েকে বিয়ে করতে হয়েছে। কিন্তু বউয়ের রঙ কালো বলে পৃথিবী অন্ধকার হয়ে যায়, এমন ছেলেও যে এযুগে থাকতে পারে রমেনের মুখ না দেখলে তা ভবতোষের বিশ্বাস হোতো না। সমস্ত ঠাট্টা পরিহাসের উত্তরে রমেন কোনো জবাব না দিয়ে কেবল ম্লান হাসে। বাল্যবন্ধু মিতভাষী রমেনের এই হাসিতে এমন একটু বেদনার আভাস থাকে যা, ভবতোষের সিনিক মনকেও স্পর্শ না ক'রে পারে না। দুঃখটা তার কাছে যত লঘুই মনে হোক রমেনকে যে তা গভীরভাবে আচ্ছন্ন ক'রে ধরেছে, এ কথা ভবতোষ মনে মনে টের পায়।

রমেনের বাবা নিবারণবাবু একদিন নিজেই এলেন ভবতোষের ওখানে।

তুমি এসেছ বাবা ভবতোষ, আমি এবার সত্যিই নিশ্চিন্ত হয়েছি। ছেলেবেলা থেকেই তোমার কথা ও মেনে চলে, ওর অসীম নির্ভর তোমার ওপর। অন্যান্য বন্ধুরা ক্ষেপিয়ে ওর আরো মাথা খারাপ ক'রে

দিয়েছে। তুমি একটু ওকে ভাল ক'রে বুঝিয়ে-সুজিয়ে বলো, এমন করলে লোকে কি মনে করবে।

কেন, কি করে ?

না, করেও না কিছু বলেও না কিছু, সেই তো হয়েছে আরো মুস্কিল। ওর ওই ভূতান্তরিত ভাব দেখেই তো আমার হৃদয় ফেটে যায়। আর ওই নিরপরাধ কচি মেয়েটার মনই বা কেমন করতে থাকে বল তো ?

সে তো সত্যিই, কিন্তু বউ একটু দেখে শুনে আনলেই পারতেন।

নিবারণবাবু চটে উঠলেন, আবার কি দেখে শুনে আনব ? সদ্বংশের ব্রাহ্মণের ঘরের মেয়ে, লেখাপড়াও মোটামুটি জানে, দেখতে শুনতেও কুশ্রী বলা চলে না, আবার কি ? তোমাদের যে একেবারে বি এ, এম এ, পাশওয়ালা অসামান্যা রূপসী না হলে পছন্দ হবে না, তা কি ক'রে জানব ?

তেমন পছন্দটাকে কি আপনি খুব খারাপ মনে করেন ?

খারাপ নয় তো কি ? ঘরের স্ত্রী খুব রূপসী আর বুদ্ধিমতী হওয়াই কি ভালো ?

ভবতোষ হাসল, তা হলে তিনি বেশি দিন আর ঘরে থাকেন না, এই তো আপনার আশঙ্কা ?

একমুহূর্ত ক্রুদ্ধ-বিস্ময়ে স্তব্ধ হয়ে থেকে নিবারণবাবুও অদ্ভুত একটু হাসলেন, না বাবা ভয় সে জন্য নয়, ঘরেই তিনি থাকেন কিন্তু পুরুষের বিদ্যাবুদ্ধি কাণ্ডজ্ঞান সমস্ত হরণ ক'রে একেবারে সর্বময়ী হয়ে থাকেন, স্বামীর আর স্বামিত্ব থাকেনা।

নিবারণবাবু বিদায় নিলে ভাবতোষ মনে মনে না হেসে পারল না, কত রকম দুঃখই যে আছে সংসারে। তার নিজের সমস্যা অবশ্য একটু ভিন্ন

ধরনের। স্নেহের আতিশয্যে তার বাবা তার ঘাড়ে একটি বউ গছিয়ে দিয়ে যাননি বটে কিন্তু অপরিমেয় দেনায় আর অসংখ্য পোষ্যে দাঁড়ির দুই পাল্লা সমান ক'রে রেখে গেছেন। দুটি বোনেরই বিয়ের বয়স প্রায় অতিক্রান্ত হতে চলেছে। অবশ্য সেজন্য ভাবতোষের খুব বেশি আফশোষ নেই, কেননা কোনো বয়সেই মেয়েরা আজকাল আর অরক্ষণীয়া নয়। কিন্তু পাড়ার ছেলেগুলি ওদের প্রেমে পড়বার জন্য নাকি অত্যন্ত ঔৎসুক্য দেখাচ্ছে। তার মধ্যে দু'একটি সবর্ণের ছেলেও আছে। অবশ্য অসবর্ণ হলেও আপত্তি ছিল না, কিন্তু সকলেই প্রেমে পড়বার জন্যে যেমন উৎসুক বিয়ে করবার জন্যে তেমন নয়। কেননা, এ সব যুদ্ধসংক্রান্ত অস্থায়ী চাকরীতে স্থায়ীভাবে কোনো মেয়ের ভরণপোষণের ভার নেওয়ার ভরসা হয় না, তার বদলে ছোটখাট উপঢৌকনে কিংবা দু'এক সন্ধ্যা সিনেমা দেখিয়ে সাময়িক প্রেমিক হতেই সাধ যায়। সেজো ভাইটি আছে মেসোপটে-মিয়ায়, মাস কয়েক ধরে তার খোঁজখবর নেই, সাংসারিক কাজ কর্মের অবসরে মা ইতিমধ্যেই তাব জন্যে ডুকরে ডুকরে কাঁদা আরম্ভ করেছেন। দুশ্চিন্তা এবং ভ্রাতৃবাৎসল্য ভবতোষের মনেও আছে, কিন্তু তবু কেন যে মায়ের কান্না শুনলে দুঃসহ বিরক্তিতে তার সমস্ত শরীর রি-রি করতে থাকে তা কে বলবে। চাকুরিস্থানেও শনি বক্রভাবে অবস্থান করছেন, ওপরওলাদের সঙ্গে বনিবনাও হচ্ছে না। অথচ ফস ক'রে ছেড়ে দেওয়ার মত অবস্থাও নয়।

এ সব দুঃখের কোনোটিই নিবারণবাবু কিংবা তাঁর একমাত্র ছেলে রমেনের নেই। ক'লকাতায় বাড়ি আছে, সওদাগরী অফিসে আছে স্থায়ী চাকুরী। পোষ্যের সংখ্যা স্বল্প। তবু এঁদের মনেও দুঃখের অভাব নেই। নিবারণ-বাবুর ছেলের মুখে নেই হাসি আর তাঁর ছেলের বউয়ের গায়ে নেই দুধে আলতার রং। কিন্তু রং তো থাকারই কথা ছিল। হয় তো নিবারণবাবুর

নিজের ব্যক্তিগত আদর্শে আর কিঞ্চিৎ আর্থিক আসক্তিতে সে রংকে কিছু নিষ্প্রভ হতে দিয়েছেন। আর ভীরু মুখচোরা রমেন জাঁদবেল বাপের সামনে যেমন মাথা তুলতে পারেনি, তেমনি ভুলতে পারছে না অর্ধশিক্ষিতা সাধারণ একটি বাঙালী মেয়ের পতিত্ব বন্ধু-সমাজে তাকে পতিত ক'রে রেখেছে। আসলে স্ত্রীর শিক্ষা এবং রূপ তো স্বজন-বন্ধুদের কাছে আত্মমর্যাদা বাড়াবার জন্যেই। দামী ঘড়ির মত, রুচিসম্মত আসবাবের মত, স্ত্রীও যদি বন্ধুদের সপ্রশংস ঈর্ষা জাগাতে না পারল, তবে আর তার সার্থকতা কি! মনে মনে হাসল ভবতোষ।

পরদিন ভবতোষ রমেনের লাইব্রেরী ঘরে গিয়ে উপস্থিত হোলো, এবং তার স্ত্রী ও শ্বশুরকুল সম্বন্ধে খোঁজ-খবর নিল। খড়দয়ের বিখ্যাত নিত্যানন্দ পরিবারের মেয়ে। সমস্ত পূর্ববংগে ওঁদের শিষ্যসেবকেরা ছড়িয়ে আছে, তাদের পারমার্থিক বিধিব্যবস্থার সঙ্গে নিজেদের আর্থিক সংস্থান সকলেই অল্পবিস্তর ক'রে গেছেন, রমেনের শ্বশুর কিছু ইংরেজী শিক্ষা পেয়ে পৈতৃক সম্পত্তিটুকুই কেবল গ্রহণ করেছেন। শিষ্যমহল অন্য সরিকদের কাছে বিক্রি ক'রে দিয়ে মহকুমা শহরের আদালতে পেস্কারী নিয়েছেন; বয়সের সময় রোজগার নিতান্ত কম করেননি, পৈতৃক তালুক এবং খামার দুই-ই কিছু কিছু বাড়িয়েছেন।
এক পুরুষে এ কালের আদবকায়দায়ও নিতান্ত কম অগ্রসর হননি। মেয়েকে ইংরেজী স্কুলের থার্ড ক্লাস পর্যন্ত পড়িয়েছেন। দু'একখানা রবীন্দ্রসংগীত শিখিয়েছেন এবং স্বামীর বন্ধুবান্ধব দেখলে যে, এক হাত ঘোমটা টানতে হয় না এটাও সে বাপের বাড়ি থেকেই শিখে এসেছে।

সব তথ্য একে একে সরবরাহ ক'রে রমেন বলল, সুতরাং বুঝতেই পারছ ভবতোষ পিতৃদেবের অভিমতে আফশোষের আমার আর কোনো কারণ থাকতে পারে না।

ভবতোষ বলল, সেটা কেবল পিতৃদেবের অভিমত তাই বা ভাবছ কেন, যাই হোক, বউতো আগে দেখাও। তারপরে বিচার ক'রে দেখব, আক্ষেপ যথার্থই তোমার কর্তব্য কিনা।

আচ্ছা তাহলে তোমার রায়ের প্রতীক্ষাতেই রইলাম।

রমেনের ন'দশ বছরের একটি বোনের সঙ্গে তার স্ত্রী এলো ঘরে। ভবতোষ আড়চোখে দেখে নিলে মেয়েটিকে, অবশ্য সঙ্গে সঙ্গেই তার মনে হোলো একেবারে সোজাসুজি তাকালেও ক্ষতি ছিল না। রমেনের বিনয় যে এমন নির্মমভাবে সত্য তা যেন বিশ্বাস করতে ইচ্ছা করে না। বছর আঠেরো-উনিশ হবে বয়স। আর এই বয়সের যৌবনটাই একমাত্র উল্লেখযোগ্য। কিন্তু পুরুষের চোখে মেয়েদের যৌবনই যথেষ্ট নয়; তার ওপর নিজের শ্রেণীগত শিক্ষার আর রুচির প্রলেপ থাকা চাই। একবার গাঁয়ের কোনো এক আত্মীয় বাড়িতে গিয়ে একটি পরমাসুন্দরী মেয়ের দিকে তাকিয়ে ভবতোষ চোখ ফিরিয়ে নিয়েছিল তার নাকে নাকছাবি দেখে। এই মেয়েটির নাকে অবশ্য নাকছাবি নেই, কিন্তু সমস্ত মুখে স্থূল সারল্যের সঙ্গে অদ্ভুত একটু চতুর মনোভাবের ঢং মিশান রয়েছে। তা যেমন হস্যকর তেমনি অশ্লীল, মেয়েটি যেন ইতিমধ্যেই জগৎরহস্যের পার দেখে ফেলেছে। পুরুষের স্বভাব, মেয়েদের সম্বন্ধে তার সমস্ত বাসনা কামনার স্বরূপ—কিছুই যেন ওর জানতে বাকি নেই।

ভবতোষ দু'হাত তুলে ছোট একটি সপ্রতিভ নমস্কার জানিয়ে বলল, বসুন, রমেন যে এমন লুকিয়ে লুকিয়ে বিয়ে ক'রে ফেলবে, তা আমি আশঙ্কাই

করিনি, মিষ্টান্নের খরচ বাঁচাবার মতলব বোধ হয় গোড়া থেকেই ছিল, না হলে একটা খবর অন্তত দিতে পারত। বা, বসুন না, দাঁড়িয়ে রইলেন যে।

মাধুরী নিতান্ত অনিচ্ছাসত্ত্বে সব চেয়ে দূরের চেয়ারটায় গিয়ে বসল। রমেনের বন্ধুদের তার ভালো লাগে না, এরা যেন কেবল যাচাই করবার জন্যে আসে তার কতটুকু বিদ্যা, কতটুকু বুদ্ধি, কতটুকু রূপ। বিয়ের চার-পাঁচ বছর আগে থাকতে এই যে যাচাই-বাছাই আরম্ভ হয়েছে এর যেন শেষ নেই। ভেবেছিল বিয়ে হয়ে গেলে আর এসব বালাই থাকবে না, কিন্তু ব্যাপারটা ইদানীং যেন আরো বেড়েছে। স্বামীর নিত্য নতুন বন্ধু আসবে আর তাদের সামনে ভেবেচিন্তে ওজন ক'রে ক'রে কথা বলতে হবে, জবাবটা একটু কাঁচা হয়ে গেলেই স্বামীর মান যায়, মন পাওয়া যায় না।

রমেন একেকদিন স্পষ্টই বলে, মানুষের সঙ্গে কথা বলতেও শেখনি।

মাধুরী ক্রুদ্ধভাবে জবাব দেয়, না শিখিনি তো, তার হবে কি, আমি লেখাপড়া শিখিনি, দেখতে ভালো না, এ কথা তো সব বন্ধুকেই তুমি বলে দিয়েছ, তবে আর তোমার লজ্জা কিসের? এতই বলেছ আর একটু বাড়িয়ে বলতে পারলে না আমার বউ বোবা, একেবারেই কথা বলতে পারে না, তাহলে তুমিও বাঁচতে আমিও বাঁচতুম।

মাধুরীর কথার ঝাঁঝে তখনকার মত রমেন নিজেই বোবা হয়ে রয়েছে।

নমস্কার বিনিময়ের পর একটু চুপ ক'রে রইল ভবতোষ, কি কথা বলা যায় এর সঙ্গে, তারপর বলল, কই আমার কথার জবাব দিলেন না?

একটু যেন চমকে উঠল মাধুরী, কোন কথার?

মিষ্টান্ন থেকে আমরা বঞ্চিত হলাম কেন?

ও, তা আমি কি জানি ?

কিচ্ছু জানেন না ?

নিশ্চয়ই আপনাদের ভাগ্যে ছি-া না।

ভবতোষ একবার রমেনের মুখের দিকে তাকাল। স্ত্রীর এমন নির্বোধ জবাবে তার মুখ হতাশায় ম্লান।

ভবতোষ বলল, যা বলেছেন। আমাদের ভাগ্যই খারাপ, রমেনের কিন্তু ভাগ্য ভালো।

কেন, একথা বলছেন যে ?

কেন বলছি তা নিশ্চয়ই আপনি জানেন।

ভবতোষের দিকে তাকাতেই মাধুরী সলজ্জে চোখ নামাল।

আপনি ঠাট্টা করছেন। এতো সবাই জানে, আমাকে ওঁর পছন্দ হয়নি।

এই সব বুঝি ও বলে বেড়ায় ?

বলেই তো, সকলের কাছেই বলে।

কিচ্ছু ঘাবড়াবেন না। ওর মুখেব কথা আর মনের কথা এক নয়। স্বামী স্ত্রী পরস্পরকে যে ভালোবাসে এ কথা বন্ধুদেব কাছে অস্বীকার করতে তারা কম ভালোবাসে না।

তাই নাকি ? আপনি জানলেন কি ক'বে ? বিয়ে করেছেন বুঝি ?

উঁহুঁ, ঠিক ধরতে পারলেন না, এ সব কথা লোকে বিয়ে করার আগেই শেখে আবার বিয়ে করার পবেই ভুলে যায়।

মাধুরী হেসে বলল, আপনার সঙ্গে কথায় পারবার জো নেই, যাই চা ক'রে নিয়ে আসি।

ভবতোষ বলল, আর আপনার কাছে কথা গোপন করবার জো নেই।

এতক্ষণ ধরে "প্রাণট চা-চাই করছিল বটে,—কি ক'রে বুঝতে পারলেন বলুন তো ?
মাধুরী দরজার দিকে এগিয়ে যেতে যেতে একবার ফিরে তাকিয়ে বলল, ও আমরা বুঝতে পারি।

সে ঘর থেকে চলে গেলে ভবতোষ রমেনের দিকে তাকিয়ে বলল, চমৎকার মেয়ে, আমার তো বেশ লাগল।
রমেন বলল, তুমি ঠাট্টা করছ ।
ভবতোষ বলল, হুঁ, আমি ঠাট্টা করবার আর মানুষ পেলাম না, কতবড় রসবোধ তোমার যে, তোমার সঙ্গে আমি ঠাট্টাপরিহাস করতে যাব, একটু কাণ্ডজ্ঞান থাকলে কি এই বউকে কেউ খারাপ বলে ?
বন্ধুর তিরস্কারে ক্ষুব্ধ হওয়ার চেয়ে মনে মনে যেন একটু খুশিই হোলো রমেন, কিন্তু তুমি ওর মধ্যে কী এমন দেখতে পেলে বল তো ?
বন্ধুর মনে আনন্দের আমেজ লেগেছে দেখে ভবতোষ মনে মনে হাসল, তারপর বলল, সে যদি আমার দুটো চোখ তোমাকে ধার দিতে পারতাম তা হলে বুঝতে। কিন্তু তা তো আর সম্ভব নয়, তাই আমি এক মুহূর্তে যা দেখলাম জীবনের বিভিন্ন মুহূর্তে একটু একটু ক'রে তোমাকে তাই দেখতে হবে।
রমেন বলল, তোমার সবটাতেই হেঁয়ালী।
হেঁয়ালীই বটে, কিন্তু বেশ লাগে মাঝে মাঝে এমন হেঁয়ালী করতে, বিশেষত জীবনটা যখন এত কাঠখোট্টা এত নীরস, একেবারে জলের মত পরিষ্কার আর জলের মত পান্‌সে, তখন মাঝে মাঝে চেষ্টা ক'রে যদি একটু দুর্বোধ্য হেঁয়ালীর ছোঁয়াচ তাতে লাগাতে পারা যায় মন্দ কি, আর তো কিছু করবার শক্তি নেই, কোনো দিক থেকেই জীবনটাকে একটু মোড়

ফেরান যায় না ; কেবল যত ইচ্ছা যত খুশি বানানো যায় কথা,' আর সেই মনগড়া কথা দিয়ে কেবল ছুঁয়ে ছুঁয়ে যাওয়া যে-জীবনকে যে-জগৎকে কিছুতেই গড়ে নেওয়া গেল না।

তারপর থেকে ভবতোষ প্রায়ই আসে রমেনদের বাড়ি। চা খায় আর কথা বলে ; অফিস আর সংসারের ঝামেলার ফাঁকে ফাঁকে অবসরটা বেশ কাটে। এ যেন একাধারে তার খেলা আর কর্তব্য ! দাম্পত্য জীবনে সুখী করতে হবে বন্ধুকে। সাধারণ আটপৌরে স্ত্রীকে প্রেয়সী বানিয়ে তুলতে হবে।

নিজের শক্তির পরিচয়ে ভবতোষ নিজেই বিস্ময় বোধ করে, কোনোদিন কাব্যচর্চার ধার সে ধারেনি, নিতান্ত কাঠখোট্টা বস্তু-জগতের মানুষ। ছেলেবেলা থেকেই নানা দুঃখদারিদ্র্যের সঙ্গে যুঝে আসতে হয়েছে। নরম ভাবালুতা তার ধাতে নেই। কিন্তু দরকার হলে সেও যে, এমন বানিয়ে বানিয়ে কথা বলতে পারে তা কে জানত।

মাধুরী সম্বন্ধে তার বাছা বাছা চমকপ্রদ বিশেষণগুলিতে রমেন খুশি হয়, চাপা লজ্জায় আর আনন্দে মাধুরীর শ্রীহীন সৌন্দর্যহীন ভোঁতা মুখও সুন্দর দেখায় ; কিন্তু সবচেয়ে খুশি হয় ভাবতোষ নিজে। এক একটি ধারালো শব্দ তার মুখ থেকে খসে পড়ে আর তার ঔজ্জ্বল্যে সমস্ত পৃথিবী যেন জ্বলজ্বল করতে থাকে।

অফিসের ফাইলের পাতা উল্টাতে উল্টাতে কিংবা কোনো সুপিরিয়র অফিসারের সামনে, হয়তো বা মায়ের সঙ্গে কোনো বৈষয়িক পরামর্শ করবার সময়—নিতান্ত অস্থানে অসময়ে অপ্রতাশিতভাবে কখন যে, একেকটি কথা মনের ভিতর থেকে নীল পদ্মের মত ভেসে ওঠে তার ঠিক নেই, আর সঙ্গে সঙ্গে পরিবারের সমস্ত প্রতিকূলতা অতিক্রম ক'রে মন প্রসন্ন মাধুর্যে

পূর্ণ হয়ে যায়। চোখের সামনে ভাসতে থাকে রমেনের ছোট ঘরখানা ঃ রমেন, তার স্ত্রী, ভবতোষ আর তার অফুরন্ত কথার ঝরণা।

নিবারণবাবু এবং পরিবারের অন্য সকলেই বেশ কৃতজ্ঞ; রমেনের মুখে হাসি ফুটেছে। হাসি ফুটেছে মাধুরীর মুখে। আর এই অসম্ভবকে সম্ভব ক'রে তুলেছে ভবতোষ, যে রমেনের অন্যান্য বন্ধুবান্ধবদের মত নয়, যে স্ত্রীর বিদ্যা এবং শ্রীহীনতার ইঙ্গিত দিয়ে রমেনকে ক্ষেপিয়ে তোলে না। ভবতোষ মনে মনে হাসে ঃ সেও অবশ্য ক্ষেপিয়েই তোলে কিন্তু এ আরেক রকমের ক্ষেপামি। সুস্থতার সঙ্গে এই ক্ষেপামির রাসায়নিক মিশ্রণ না ঘটলে রঙ থাকে না পৃথিবীতে রস থাকে না।

রমেন আর মাধুরী সিনেমায় যাবে, সঙ্গী ভবতোষ। খেয়াল হোলো জ্যোৎস্না রাত্রে নৌকো ক'রে ওরা গঙ্গায় বেড়াবে, ভবতোষ সঙ্গে আছে। ভবতোষ না হলে ওরা অসম্পূর্ণ। আর ওরা সামনে না থাকলে, সঙ্গে না থাকলে, ভবতোষের কথার উৎস অমন স্বতঃস্ফূর্তভাবে ভরে ওঠে না।

সেদিন অফিস ছুটি। কিন্তু সাংসারিক কাজে ছুটি নেই। সমস্ত দিনটা মায়ের ফাইফরমাস খাটতে হোলো। বোনদের আবদার মত কিছু জিনিস আনতে হোলো বাজার থেকে। ছোট ভাই এসে চেপে ধরল, তার অঙ্ক বুঝিয়ে দাও। সকলের দাবি মিটিয়ে ভবতোষ একটু বাইরে যাচ্ছে, মা ডেকে বললেন, এই রোদ্দুরে কোথায় বেরুচ্ছিস খোকা, এখনো তো তিনটে বাজেনি।

ভবতোষ একটু রুক্ষভাবে বলল, কেন আরো কিছু দরকার আছে নাকি, বলে ফেলো।

না, আমার আর কিছু দরকার নেই। চা-টা খেয়েই না হয় বেরুতিস।

ও, সে চায়ের তো তোমাদের অনেক দেরি, আমার একটু কাজ আছে বাইরে।

রান্নাঘরের সামনে দিয়েই পথ। সেটুকু অতিক্রম করতে না করতেই ছোট বোন নীলিমা এসে সামনে দাঁড়াল। হাতে চায়ের কাপ, অল্প অল্প রুপালি ধোঁয়া উঠছে।

নীলিমা হেসে বলল, তোমার কাজ যে কোথায় তাতো জানি রাঙাদা, চা টা খেয়েই যাও, তাতে অন্য জায়গায় আর এক কাপ খাওয়ার নিশ্চয়ই বাধা হবে না।

অসাময়িক এবং অপ্রত্যাশিত চায়ে তৃপ্ত হয়ে ভবতোষ বলল, খুব যে কথা শিখেছিস, কোথায় যাচ্ছি কি ক'রে জানলি?

সেটা জানা এমন কিছু আশ্চর্য নয়, কিন্তু আশ্চর্য তোমার পছন্দ।

ভবতোষ সকৌতুকে বলল, কেন পছন্দটা এমন মন্দ দেখলি কিসে।

নীলিমা মুখ বাঁকিয়ে বলল, না মন্দ আর কি। তবু যদি রমেনদার বউকে স্বচক্ষে না দেখতাম।

রমেনদার স্ত্রীর প্রসঙ্গে নীলিমার কাছে ভবতোষ নিজেই এমন অনেকবার মুখ বাঁকিয়েছে, কিন্তু আজ নীলিমার এই মুখ বাঁকানো—তীরের বাঁকা ফলার মত গিয়ে তার হৃদয়ে ঢুকল। অথচ কথাটি তো সত্যি। প্রশংসা করবার মত কিছুই নেই মাধুরীর মধ্যে। আর এই না থাকায় কিছুমাত্র ক্ষতিও নেই ভবতোষের। তবু একটা তীব্র বেদনায় মন যেন আচ্ছন্ন হয়ে গেল।

রমেন মাধুরীকে নিজের লেখা একটা গল্প পড়ে শোনাচ্ছিল, ভবতোষ এসে ঘরে ঢুকল।

ইশ রসভঙ্গ ক'রে ফেললাম নাকি?

মাধুরী একটু সরে বসে সলজ্জভাবে বলল, না-না, আসুন আসুন, আমি তো ভাবতেই পারিনি এই দুপুরে—

ভবতোষ চেয়ার টেনে বসে বলল, আমার দুর্ভাগ্য, অথচ আমি যদি বলি এই দুপুর ভরে আমি কেবল এই কথাই ভেবেছি তাহলে রমেন গল্প রেখে এখুনি লাঠি নিয়ে আসবে, সুতরাং সে কথা মনেই চাপা থাক। গল্পটা শেষ ক'রে ফেল রমেন।

মাধুরী বাধা দিয়ে বলল, না না, ও থাক। লেখা গল্পের চেয়ে মুখের গল্পই আমার ভালো লাগে, ভগবান যখন মুখ দিয়েছেন তখন কেন যে, মানুষ গল্প না বলে লিখতে যায় আমি বুঝতে পারি না।

ভবতোষ বলল, আমিও না। কিন্তু অমন ক'রে বলবেন না, রমেন আমাকে এক্ষুনি ঘর থেকে বার ক'রে দেবে!

রমেন হেসে বলল, যাই বলো ভবতোষ, ইদানীং তুমি যেন বড় ভীরু হয়ে পড়েছ, এত ভীরুতা যেন ভালো ঠেকছে না।

ভবতোষ মাধুরীর দিকে তাকিকে বলল, ওই শুনুন।

মাধুরী উঠে দাঁড়িয়ে বলল, দুই বন্ধুতে বসেই শোনাশুনি করুন, আমি যাই কাজ আছে।

ভবতোষ বলল, যাঃ, আমি আসবার সঙ্গে সঙ্গেই আপনার কাজের কথা মনে পড়ে গেল।

মাধুরী বিব্রত হয়ে বলল, আচ্ছা বলুন, আপনার কথা শুনেই যাই।

ভবতোষ বলল, আমার প্রথম কথাই হোলো এই, আমার কথা শুনেই যেতে পারবেন না।

তবে কি করতে হবে?

শুনে বসে থাকবেন এবং বসে শুনতে থাকবেন।

মাধুরী বলল, বাঃ, আপনার আবদার তো কম নয়, আর আমার

কাজ ক'রে দেবে কে ? বাজে কথা ছাড়ুন, কি বলবেন চট ক'রে বলে ফেলুন দেখি।

মাধুরির ভাবান্তরটা ভবতোষ লক্ষ্য না ক'রে পারল না। এই রূপহীনা অর্ধশিক্ষিতা মেয়েটি আত্মপ্রত্যয়ে হঠাৎ এমন দৃঢ় হয়ে উঠল কি ক'রে ?

ভবতোষ বলল, একটি মেয়ে আপনার নিন্দা করছিল।

আমার ? কেন ?

কেন আবার ? নিন্দার কি কোনো কারণ থাকে ? বলছিল আপনার নাকি রূপ নেই।

একবার আরক্ত হয়ে মাধুরীর মুখখানা আরো ম্লান হয়ে উঠল, সে কথা তো সত্যিই।

ভবতোষ বলল, না সতি নয়, রূপ ধরবার মত চোখ সকলের থাকে না। আর রূপটা বড় কথা নয়। আমরা পাঁচজনে মিলে তার একটা বাঁধা-ধরা সাধারণ মাপকাঠি তৈরি করেনি। আমরা যাকে বলি অসাধারণ তাও সেই কাঠির মাপেই মাপা। সেই মাপের একটু এদিক ওদিক হলে আর রূপ আমরা দেখতে পাই না, কিন্তু সে আমাদের দৃষ্টিরই দুর্বলতা। রূপ দিয়ে কি হবে, আপনার স্বরূপ আছে, যা রূপের চেয়ে অনেক দামী।

মাধুরীকে যেতে দেখে ভবতোষ বলল, ও কি, চলে যাচ্ছেন যে ?

মাধুরী চলে যেতে যেতে বলল, এই বুঝি আপনার কজের কথা, ফের যদি আবার আপনি ও রকম পাগলামি শুরু করেন—বলতে বলতে মাধুরী বেরিয়ে গেল।

রমেনও একটু বিস্মিত হয়ে বলল, সত্যি ভবতোষ, হোলো কি তোমার, পাগল হয়ে গেলে নাকি তুমি ?

তার কণ্ঠের বিরক্তি চাপা রইল না।

হঠাৎ ঘা খেয়ে ভবতোষ ম্লান হেসে উঠে দাঁড়াল, তোমার বউকে একটু ক্ষেপিয়ে দিচ্ছিলাম। কিন্তু তুমি যে ক্ষেপে যাবে—

না না, বসো বসো।

কিন্তু ভবতোষ আর বসল না। না আর নয়, আর তাকে দিয়ে কোনো প্রয়োজন নেই। এবার তার প্রস্থানের সময় হয়েছে।

তবু কি অদ্ভুত কথা : রূপ আর স্বরূপ। কিন্তু এর চেয়েও আরো ভালো কথা আরো চমৎকার ক'রে কেন বলতে পারল না ভবতোষ, যাতে মাধুরীর সমস্ত কুশ্রীতা সমস্ত মালিন্য, দেহমনের সকল দৈন্য ঢাকা পড়ে যায় ; যে কথার টুকরো হীরকখণ্ডের মত ওর সমস্ত অঙ্গ ভরে জ্বলতে থাকে !

ভবতোষ একবার থমকে দাঁড়াল। এসব কি ভাবছে সে ? না, আর নয়। যথেষ্ট কৌতুক করা হয়েছে। এবার নিজেকে ওদের ভিতর থেকে সরিয়ে আনতে হবে, তার আর কোনো প্রয়োজন নেই। বন্ধু রমেন ওই কুশ্রী কুরূপা বউকে ইতিমধ্যেই দুর্লভ মাথার মণি ক'রে তুলেছে, হারাই-হারাই ভাবে মন তার শঙ্কিত। এরই মধ্যে ওর ঈর্ষাকাতর সন্দিগ্ধ দৃষ্টি চোখে ভাসতে শুরু করেছে। ভবতোষ নিজের মনেই হাসল। আর নয়, উদ্দেশ্য তো সিদ্ধ হয়েছে এবার ভবতোষ নিজেকে নেপথ্যে নিয়ে যাবে। অনেক কাজ পড়ে রয়েছে তার।

ভবতোষ ওদের বাড়ির সীমানা পার হয়ে অন্য দিকে হাঁটতে শুরু করল। কিন্তু কী অদ্ভুত ভ্যানিটি মেয়েদের, মাধুরীর মত মেয়েও কি ক'রে ভাবতে পারল এই উচ্ছ্বসিত স্তবস্তুতি তার জন্যেই, আর এ সব একেবারে অকৃত্রিম—একটুও ঠাট্টা নয়। আসলে ভবতোষ যদি কারো রূপে মুগ্ধ হয়ে থাকে সে তার আপন কথার মাধুরীর। কিন্তু সে কথা রমেনের বুঝবার সাধ্য নেই, তার স্ত্রীর তো নেই-ই।

ঘুরে ঘুরে কখন এসে ভবতোষ অন্যমনস্কের মত ওদের সদর দরজা দিয়ে ঢুকে ছাদের নিচে এসে দাঁড়িয়েছে। ওরা কেউ দেখলে কি ভাববে। এই মুহূর্তেই ভবতোষের এখান থেকে চলে যাওয়া উচিত। কিন্তু সে দিনের মত আবার যদি সে এসে ছাদের আল্‌সে ধরে ঝুঁকে দাঁড়ায় আর ভবতোষকে দেখতে পেয়ে বলে, কি চা না খেয়েই পালিয়েছিলেন যে বড় ?

ভবতোষ বলবে, পালাবার কি আর জো আছে !

মাধুরী হেসে জবাব দেবে, জো নেই, স্বীকার করছেন তাহলে ?

হঠাৎ ভবতোষের সমস্ত শরীর শিউরে উঠল, এক দুর্বোধ্য আনন্দ আর দুঃসহ বেদনায় তার সমস্ত সত্তা যেন আচ্ছন্ন হয়ে গেছে। এ কি হোলো, তার অপরূপ কথার মাধুরী কেবল কি পৃথিবীর ওই একটিমাত্র কুরূপা মেয়ের দেহাধার ছাড়া কিছুতেই অন্য কোনো রূপ খুঁজে পেল না ?

রোগ

কিছুক্ষণ আগে একরকম জোর করেই কল্যাণী বিভূতিকে বসিয়ে গেছে নীলিমার রোগশয্যার পাশে। হেসে বলেছে, কি রকম ভাই তুমি, ভাড়া-করা নার্সরাও তো একটু নাওয়া খাওয়ার ছুটি পায়। আমরা কি তাও পাব না? কেবল ফাঁকি দিয়ে পালিয়ে পালিয়ে বেড়াবে। এমন স্বার্থপর লোক যদি আর দুটি থাকে। আজ তো রবিবার, আজ তো আর অফিসটপিস নেই তোমার। আড্ডা? তা নয় একটা দিন বাদই দিলে? আজ সারাদিন তোমার ডিউটি রইল এখানে। মনে কর অফিসেই আছ। একটুও যদি ঘরে ঢুকি আমরা আজ। তারপর বিভূতির চোখের দিকে চেয়ে অভয় দিয়ে গেছে, একটুক্ষণ কেবল বস, খেয়েই চলে আসব। ও তো ঘুমুচ্ছে। কিচ্ছু করতে হবে না তোমাকে, শুধু বসে বসে কেবল পাহারা দেওয়া।

কিন্তু এই কয়েক মিনিটেই বিভূতির দম বন্ধ হবার জো হয়েছে। আর যা কিছু বল তাই সে করতে পারে, দৌড়োদৌড়ি ছুটোছুটি, ডাক্তার ডাকা, ওষুধ আনা কিছুতেই সে পিছ্‌পা নয়; কিন্তু সেবাশুশ্রূষা তার দ্বারা হবে না। এই ভূতের মতন রোগীর ঘরে চুপচাপ বসে থাকা—নিজেকেই যেন রোগী বলে মনে হয় একেক সময়।

মাসখানেক ধরে প্রায় যমেমানুষে টানাটানি গেছে নীলিমাকে নিয়ে। জলের মত ব্যয় হয়েছে টাকা। এই বাজারেও দামী ওষুধপত্র কিনতে

বিভূতি কার্পণ্য করেছে তা কেউ বলতে পারবে না। তবু শ্বশুরবাড়ির লোক খুশি হয়নি, নীলিমার মনে অসন্তোষ রয়ে গেছে। মেয়েদের মত কাজকর্ম বন্ধুবান্ধব ফেলে সে যদি দিনরাত বসে বসে সেবা করতে পারত তা হলেই কেবল হৃদয়ের পরিচয় দেওয়া হোতো যেন, তা হলেই সখ মিটত সকলের।

প্রথম কিছুদিন বিভূতির অদ্ভুত অপটুতায় কেউ কোনো কথা বলেনি। বরং একটু একটু উপভোগই যেন করেছে। রোগ, রোগের চিকিৎসা কি নার্সিং সম্বন্ধে সাধারণ জ্ঞানটুকু পর্যন্ত যেন নেই বিভূতির। শিশি থেকে ওষুধের গ্লাসে এক এক ডোজ ওষুধ ঢালতে পর্যন্ত সে পারে না— যা পাঁচ সাত বছরের ছেলেমানুষেও পারে। কথায় কথায় এমন সব মন্তব্য ক'রে বসেছে যে, ক্ষিতীশবাবু, মন্দাকিনী বা কল্যাণী কেউ না হেসে থাকতে পারেননি। সে সব কথা শুনে কে বলবে বিভূতি একজন উচ্চ শিক্ষিত পূর্ণবয়স্ক যুবক—আ-কৈশোর যার ক'লকাতায় কেটেছে। গাঁয়ের কোনো নিরক্ষর চাষীও এর চেয়ে বেশি জ্ঞান রাখে। বিভূতি কি চোখকান বুজে চলে, এতখানি বয়স পর্যন্ত সে কি কারো অসুখবিসুখ হতে দেখেনি, ওষুধপত্রের নাম শোনেনি, কোনো ডাক্তার কবিরাজের সঙ্গে আলাপ করেনি কোনোদিন ?

কিন্তু নীলিমার রোগভোগের দিন যত বেড়েছে, রাত জাগার পালা যত বেশি পড়েছে, ততই বিভূতির অদ্ভুত অপটুতা থেকে সকলের সস্নেহ প্রশ্রয় এবং কৌতুক উপভোগের মাত্রা কমতে কমতে শেষে একেবারে নিশ্চিহ্ন হয়েছে। প্রত্যেকেই বিরক্ত হয়েছে। সব কিছুরই একটা সীমা আছে। নাওয়া নেই খাওয়া নেই, বুড়ো মানুষ হয়ে রাতের পর রাত জাগছেন ক্ষিতীশবাবু—সারাদিনের অফিসের খাটুনির পর। এক মুহূর্ত বিশ্রাম

নেই মন্দাকিনী আর কল্যাণীর, আর স্বাস্থ্যবান জোয়ান পুরুষ হয়ে বিভূতি পাশের ঘরে নাক ডেকে ঘুমুচ্ছে, ছুটির দিনে বন্ধুমহলে আড্ডা দিয়ে ফিরছে রাত বারোটায়—এদিকে নিজের স্ত্রী বসেছে মরতে। মায়া দয়া, কর্তব্যবোধ না থাক, একটু চক্ষুলজ্জাও তো থাকে মানুষের।

এসব সম্বন্ধে কিছু কিছু আলোচনা বিভূতির যে কানে না গেছে তা নয়। কানে যাতে যায় সেই জন্যেই এসব আলোচনা হয়েছে, বিভূতি পাশের ঘরে আছে তা জেনেও।

সত্যি কলিদি, ভারি কষ্ট হচ্ছে আপনাদের। আমি তখনই তো বলেছিলাম হাসপাতালে দিয়ে আসি, কিংবা রেখে আসি আমার মার কাছে, নিজের বাসায়। সেখানে শুশ্রূষার কোনো অসুবিধা হবে না। মা'র কিছুতে ক্লান্তি নেই। আমার মা এমন পাঁচ সাতটা রোগীর শুশ্রূষা করতে পারেন একা। আর কারো দরকার হয় না তাঁর।

কল্যাণীর মুখ শক্ত এবং কালো হয়ে উঠেছে, তারপর তীক্ষ্ণ একটু হেসে বলেছে সে, তাই তো এমন মার এমন ছেলে। কিন্তু যে রকম রোগী, তোমার বাড়িতে নিয়ে যেতে শুশ্রূষার আর দরকার হোতো না, একেবারে কেওড়াতলায় নিয়ে হাজির করতে হোতো।

তা হোতোই বা, কষ্ট তো আপনাদের এমন ক'রে পেতে হোতো না রাত জেগে জেগে। আচ্ছা, কাল থেকে একটা নার্স ঠিক ক'রে দি কেমন?

কোনো জবাব না দিয়ে কল্যাণী নিজের কাজে মন দিয়েছে। শিক্ষিত হলেই মানুষের হৃদয় বড় হয় না। এত অকৃতজ্ঞ, এত অভদ্র আর ছোট অন্তঃকরণ বিভূতির। দু'দিনের মধ্যে তার সঙ্গে কথা বলতেই প্রবৃত্তি হয়নি কল্যাণীর।

খানিক বসে থেকে অতি সন্তর্পণে বিভূতি উঠতে যাচ্ছে নীলিমা ধীরে ধীরে চোখ মেলল।

পালাচ্ছ বুঝি?

ক'দিন ধরে একটু একটু কথা বলতে পারে নীলিমা। বিভূতি বলল, পালাচ্ছি মানে? ও ঘর থেকে আসছিলাম একটু। নীলিমা একটু চুপ ক'রে যেন দম নিল। তারপর আবার আস্তে আস্তে বলল, আচ্ছা যাও। ভারি কষ্ট হয় তোমার, ভারি ঘেন্না করে এখানে আসতে না?

নিষ্করুণ কঠিন কণ্ঠে বিভূতি জবাব দিল, ঠিক ধরেছ। বিভূতি আবার উঠে দাঁড়ালো। এবার নীলিমা তার দুর্বল ক্ষীণ হাতখানি দিয়ে বিভূতির পায়ের পাতা স্পর্শ করল, একটু বসো শুধু আর একটুখানি।

নীলিমার দিকে তাকালো বিভূতি। কী করুণ আর ক্লান্ত দুটি চোখ নীলিমার। ভারি মায়া হয় দেখলে। মনেই পড়ে না, এই একটু আগেও দুর্বল কণ্ঠে কী কঠিন কথা তাকে বলছে নীলিমা। ওর বিছানার পাশে ঘেঁষে আবার বসে পড়ল বিভূতি। দু'একগাছ রুক্ষ চুল ওর কপালের ওপর উড়ছে। বিভূতি হাত দিয়ে সরিয়ে দিতে গেল। নীলিমা তার শীর্ণ দুর্বল হাত রাখল বিভূতির হাতের ওপর, বলল, আর চলে যেও না।

এই নির্ভরতা, এই সম্পূর্ণ আত্মসমর্পণ—ভারি চমৎকার লাগল বিভূতির। এমন মিষ্টি কাতর মিনতি নীলিমার কণ্ঠে যেন আর কোনোদিন শোনা যায়নি। বিভূতি ওর সর্বাঙ্গে একবার চোখ বুলিয়ে নিল। দীর্ঘ ঋজু দেহ আরো শীর্ণ হয়েছে রোগে। ফ্যাকাশে হয়েছে রঙ, রক্তের চিহ্নমাত্র নেই এতটুকু। তবু এই রোগশীর্ণ দেহ কেমন যেন ভারি সুন্দর লাগল বিভূতির চেখে। কেমন অসহায়ভাবে বিছানার সঙ্গে একেবারে যেন

মিশে রয়েছে নীলিমা। কিন্তু এই রুগ্নতা এক অপূর্ব করুণ সৌন্দর্য এনে দিয়েছে যা, কোনোদিন চোখে পড়েনি বিভূতির। এক মুহূর্ত বিভূতি অপলকে তাকিয়ে রইল ওর দিকে। সুন্দরী নারীর দেহে যে কোনো কিছুই অলংকার হয়ে ওঠে ; কিন্তু রোগও যে এমন অপরূপ সুষমা এনে দিতে পারে তা তো বিভূতির জানা ছিল না। রোগকে তাহলে যতটা কুৎসিত সে ভেবেছিল তা কি সে নয় ?

বিভূতির অপলক মুগ্ধ দৃষ্টির দিকে হঠাৎ চোখ পড়ল নীলিমার। কী বুঝল, সেই জানে। একটু কি রক্তের আভাস দেখা দিল তার শীর্ণ কপালে, একটু বুঝি হাসি এসে গেল তার পাতলা শুকনো ঠোঁট দু'টির মাঝখানে। গভীর আত্ম-তৃপ্তিতে নীলিমা বলল, আমি যদি মরে যেতাম, কী করতে ?

বিভূতি বলল, মরে যাবে কেন ?

নীলিমার পাতলা ঠোঁটে আবার একটু হাসি ফুটে উঠল, তুমি আর চলে যাবে না বলো, সব সময়েই থাকবে এখানে ?

বিভূতি তার সরু লম্বা আঙুলগুলি আলগোছে রাখল ওর ঠোঁটের ওপর। যেন ওই ক্ষীণ পাতলা হাসিটুকু আঙুল দিয়ে সে ছুঁয়ে দেখতে চায়। সস্নেহে বলল, সব সময়েই তো এখানে আছি নীলি।

নীলিমা নিশ্চিন্তে একবার চোখ বুজল। নিজের শক্তি সম্বন্ধে এতক্ষণ সে সচেতন হয়ে উঠেছে। আর সাধ্য নেই বিভূতির তাকে ঘৃণা করবার, তার রোগকে ঘৃণা করবার, তার কাছে না এসে থাকবার। ওর চোখের মুগ্ধতা নীলিমাকে আশ্বাস দিয়েছে, পথ দেখিয়েছে।

পরদিন অফিসের পর বিকাল বেলায় বিভূতিকে আর ডেকে বসাতে হোলো না, নিজেই এসে সে বসল। কেমন আছ এখন নীলি ?

নীলিমা পরম নির্ভরতার সঙ্গে তার হাতখানা বিভূতির কোলের ওপব

তুলে দিল, এখন? এখন খুব ভালো লাগছে। বিভূতির দিকে চেয়ে নীলিমা একটু হাসল। অদ্ভুত লাগে ওর এই রুগ্ন দুর্বল হাসি। নীলিমা বলল, ভারি স্বার্থপর আমি, না? সব সময় তোমাকে কাছে আটকে রাখতে চাই। ভালো লাগে না যে একটুও তোমাকে ছাড়া। আর কেউ কাছে এলে রাগ হয়ে যায় আমার। ওরা ভাবে রোগে ভুগে ভুগে আমার মেজাজ খিটখিটে হয়ে গেছে। সত্যিই কি খিটখিটে হয়ে গেছি আমি খুব?

যে কথাগুলিকে অন্য সময় ন্যাকামি মনে হতে পারত বিভূতির, এখন এই রোগশয্যায় নীলিমার অসহায় দুর্বলকণ্ঠে তা অত্যন্ত মধুর লাগে। নীলিমার আঙুলগুলি নিয়ে বিভূতি নাড়াচাড়া করতে থাকে; ভালো লাগে ওর রুক্ষ চুলগুলির ওপর হাত বুলাতে, ছোট সাদা কবুতরের মত কী কোমল, পেলব আর অসহায় এই নীলিমা। অতি সন্তর্পণে ওকে বুকে তুলে নিতে ইচ্ছা করে বিভূতির। কিন্তু সাবানের ফেনার মত নরম আর ক্ষণস্থায়ী ও। ওকে ধরলেই যে মিলিয়ে যাবে!

নীলিমা বলে, তুমি শুধু আমার কাছে বসে থাকো। আর কিচ্ছু চাই না, কাউকে চাই না আমার। কোনো ওষুধবিষুধ লাগবে না, শুধু তুমি আমার কাছে কাছে থাকো, তাতেই আমি ভালো হয়ে উঠব।

বিভূতি ওর হাতটা নিজের মুঠির ভিতর নিয়ে আস্তে আলগোছে একটু চাপ দেয়, আমি তো তোমার কাছেই আছি নীলি।

বেল ফুলের একটা চারা আছে টবে উঠানের একধারে। দু'তিনটে ফুল ফুটেছে তাতে। কল্যাণীকে দিয়ে ফুল দুটো তুলে আনালে নীলিমা। বিভূতি আসতে তার হাতে দিয়ে বলল, নাও।

প্রথম প্রেমের দিনগুলি যেন ফিরে এসেছে নতুন ক'রে। সেই একটু

ছোঁয়া, একটু কথা, একটু হাসি। আর এই টুকরোগুলি জড়ো ক'রে মনে মনে তা দিয়ে মালা গাঁথা।

কী হয়েছে বিভূতির। নতুন এক নেশায় যেন পেয়ে বসেছে তাকে। অফিসে কোনোরকমে ঘণ্টা সাতেক কাটিয়ে আজকাল সে একেবারে সোজা চলে আসে নীলিমার কাছে। আড্ডা নেই, বন্ধুবান্ধব নেই, সমস্ত পৃথিবী যেন ধরা দিয়েছে নীলিমার ঘরটুকুর মধ্যে। পরিসর তার কম, কিন্তু কী ঘন আর কী গভীর। আর প্রায় প্রতিদিনই নতুন নতুন রঙ বে-রঙের ফুল কিনে নিয়ে আসে বিভূতি। রুক্ষ এলো চুলের মধ্যে গুঁজে দেয়, কয়েকটা বালিশের পাশে আর বিছানা ভরে ছিটিয়ে রাখে।

মন্দাকিনী বড় মেয়েকে আড়ালে ডেকে বলেন, ও কি হচ্ছে, যত সব সৃষ্টিছাড়া কাণ্ড। অসুখের বিছানায় ফুল ছড়িয়ে রাখতে কেউ কোনোদিন দেখেছে কখনো? নিষেধ ক'রে দিস তো বিভূতিকে। কল্যাণী ম্লান হাসে, আমি নিষেধ করবার কে মা? আমার নিষেধ অন্যে শুনবেই বা কেন?

কিন্তু এক ফাঁকে কল্যাণী ঘরে ঢোকে ওদের। বলে, ইশ, ফুলের গন্ধে ঘর একেবারে ভরে উঠেছে যে! এ কি রোগশয্যা না ফুলশয্যা নীলি?

নীলি বলে, ফুলশয্যার দিনে আমার জ্বর হয়েছিল মনে আছে দিদি? আজ রোগশয্যায় তার প্রতিশোধ নিচ্ছি।

ভারি সুন্দর লাগলো নীলিমার কথা বিভূতির। এত চমৎকার ক'রে সে বলতে পারে। আর এমন একান্ত ক'রে সম্পূর্ণ ক'রে নীলিমাকে যেন কোনোদিন পাওয়া যায়নি। নীলিমা সম্পূর্ণ তার। ভাবতেও কী আনন্দ লাগে, কী চমৎকার এর অনুভূতি। মৃদু গুঞ্জরণে সময় কাটে। কত কথা আর কত গল্প। নীলিমা বলে, মরে গেলে তো ভারি ঠকে যেতাম, তোমাকে এমন কাছে পেতাম কেমন করে? হঠাৎ নীলিমার

চোখ দু'টি সজল হয়ে ওঠে, ভারি হয়ে আসে গলা। বিভূতি ছেলেমানুষের মত বলে, মরে গেলেই হোলো আর কি ?

নীলিমা বলে, কিন্তু এই অসুখে অনেক টাকা পয়সা তোমার নষ্ট হয়ে গেল তো।

বিভূতি যেন লজ্জিত বোধ করে টাকাপয়সার কথায়, তা যাক, তোমাকে তো ফিরে পেলাম।

শান্ত গভীর চোখ মেলে নীলিমা স্বামীর দিকে তাকায়। নির্ভর প্রসন্নতায় অদ্ভুত সুন্দর দুটি চোখ। এত মূল্য নীলিমার স্বামীর কাছে, এত মূল্য তার মত নিতান্ত সাধারণ একটি মেয়ের ?

একান্ত ক'রে নীলিমার এই আত্মসমর্পণ অতি অপূর্ব মনে হয় বিভূতির।

কিন্তু সেরে উঠতে বেশ সময় লাগে নীলিমার। অমাবস্যা পূর্ণিমায় অন্য উপসর্গের সঙ্গে জ্বরও বাড়ে। আবার ডাক্তার আসে, আসে ওষুধপত্র। কিন্তু কল্যাণীদের আর তেমন সম্পূর্ণ অংশ গ্রহণ করতে হয় না। সেবা-পরিচর্যা ইতিমধ্যেই কিছু কিছু শিখে ফেলেছে বিভূতি। নীলিমার শুশ্রূষায় বিভূতি যেন নতুন এক আনন্দের আস্বাদ পেয়েছে। যে সব কাজকে আগে সে ভয় করত, ঘৃণা করত, তাতে এখন আর তৃপ্তির অন্ত নেই।

আরো এক নতুন খেয়াল দেখা দিয়েছে বিভূতির। ওষুধপত্র তো আনেই সঙ্গে সঙ্গে কোন এক ডাক্তার বন্ধুর কাছ থেকে মোটামোটা ডাক্তারী বইগুলিও সে বয়ে নিয়ে আসে, আর নীলিমার শিয়রে বসে রাত জেগে ম্লান আলোয় ওই সব রূঢ় বিজ্ঞানের বই সে পড়তে আরম্ভ করে। জটিল স্ত্রীরোগে ভুগছে নীলিমা। ডাক্তারের কথায় সব বোঝা যায় না, ডাক্তার কোনোদিন সব কিছু খুলে বলেও না রোগীর আত্মীয়স্বজনকে। নিজেকেই কষ্ট ক'রে জানতে হবে বিভূতির কোথায় ওসবের উৎপত্তি, কিসেই বা এর

নিরাময়। সব বোঝা যায় না। মাঝে মাঝে ভারি রূঢ় লাগে, তবু অসীম ধৈর্য বিভূতির, অপরিসীম অধ্যবসায়। নীলিমার জন্য সমস্ত চিকিৎসাশাস্ত্রকেই সে যেন ভালোবেসে ফেলেছে। নতুন এক জ্ঞানের রাজ্যে প্রবেশ করেছে সে। এমন যে নীরব বিজ্ঞান তাও নীলিমার সাহচর্যে অপূর্ব রসময় হয়ে উঠেছে তার কাছে। আজ যা রাত জেগে পড়ে, কাল তা নীলিমাকে সে সরস ভাষায় বুঝিয়ে দেয়; বেশ লাগে বিভূতির।

চিকিৎসক হিসাবে বেশ খ্যাতি আছে বীরেনবাবুর, অভিজ্ঞতাও দীর্ঘ দিনের। সময় লাগলেও নীলিমা দিনের পর দিন ভালোই হয়ে উঠেছে তাঁর চিকিৎসায়, তবু এই দিনগুলির কি আর শেষ হবে না, যেন যুগের পর যুগ কেটে যাচ্ছে। কতদিনে নীলিমা উঠে দাঁড়াতে পারবে? সবাইকে নীলিমা জিজ্ঞাসা করে। স্বামীকে বলে, কত কষ্টই যে তোমাকে দিচ্ছি মাসের পর মাস।

কষ্ট! আমার তো একটুও কষ্ট হয় না নীলিমা।

বিভূতির কণ্ঠে প্রসন্নতার আভাস পেয়ে নীলিমা কিছুক্ষণ অবাক হয়ে থাকে।

পর পর গোটা দুই জো' বাদ যায়। তারপর থেকে বেশ দ্রুতবেগেই সুস্থ হয়ে ওঠে নীলিমা। বীরেনবাবু বিস্মিত হন। এত প্রাণশক্তি ওর মধ্যে। এত দীর্ঘ রোগ ভোগের পর এত তাড়াতাড়ি স্বাস্থ্যলাভ করতে তো কাউকে দেখা যায় না। আজকাল একটু একটু উঠে বসতে পারে নীলিমা। বসে বসেই হাত বাড়িয়ে ওষুধের শিশি আর অন্য সব জিনিসগুলি নিজের পছন্দ মত গুছিয়ে রাখতে চেষ্টা করে।

বিভূতি বলে, ওসব দুদিন বাদেই না হয় কোরো নীলিমা, আগে ভালো হয়ে ওঠো।

নীলিমা অস্বাভাবিক জোর দিয়ে বলে, ভালো তো আমি হয়েই গেছি। চিকিৎসকও তাতে সায় দেন। ওকে স্বাধীন স্বচ্ছন্দভাবে চলতে দেওয়াই এখন ভালো। মনের জোরই আসল জোর।

দেখতে দেখতে যেন নতুন শরীর গ্রহণ করে নীলিমা; শরীরকে পিছনে ফেলে এগিয়ে যায় তার মনের উৎসাহ। নারকেল গাছ দুটোর ফাঁকে হলুদ রঙের চাঁদ ওঠে গোল হয়ে! কী সুন্দর, কী চমৎকার নতুন সবুজ পৃথিবী তার চোখের সামনে। দু'একজন আত্মীয় বন্ধু আসে অভিনন্দন জানাতে। হাতে টুকিটাকি উপহারের জিনিস। উল্লাসে উচ্ছ্বাসে বালিকার মত চপল হয়ে ওঠে নীলিমা। যেন মানুষ এই প্রথম দেখল জীবনে।

অরুণদা, চল না সিনেমায় নিয়ে যাবে আজ আমাকে সন্ধ্যার শোতে।

অরুণ হাসে, আজ নয় নীলি, আরো যাক দু'চার দিন।

নীলিমা যেন আটদশ বছরের মেয়েতে পরিণত হয়েছে, কেন যাবে আরো দু'চার দিন? আজই, আজই চল। বিশ্বাস কর, আমি সম্পূর্ণ ভালো হয়ে গেছি। ভালো হইনি?

নিশ্চয়ই, সুন্দরও হয়েছ।

নীলিমা খিল খিল ক'রে হেসে ওঠে। তোমার অসভ্যতা আর গেল না অরুণদা।

আর পাশের ঘরে বসে তার এই হাসি আর উল্লাস অত্যন্ত কুশ্রী মনে হয় বিভূতির কাছে। কী হাল্কা, কী ছেলেমানুষ হয়ে গেছে নীলিমা। কোথায় গেল অতল রহস্যময় কালো চোখের সেই করুণ প্রশান্ত দৃষ্টি? কোথায় সেই অনুভূতিঘন গভীরতা? সে মরে গেছে, সে নীলিমা আর নেই।

ট্রাঙ্ক থেকে দামী বিচিত্র রঙের শাড়ী বার করল নীলিমা, প্রসাধন করল অনেকক্ষণ ধরে আয়নার কাছে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে। নিজের প্রতিবিম্বের দিকে সে মুগ্ধ হয়ে চেয়ে রইল কিছুক্ষণ। বেশ লাগে নিজেকে দেখতে। খানিক পরে ঘুরে গেল বিভূতির ঘরে। বিভূতি ঘাড় গুঁজে সেই মোটা ডাক্তারী বইটা পড়ছে। নীলিমা তার হাত থেকে কেড়ে নিয়ে ছুঁড়ে ফেলে দিল বইটাকে। ওকি হচ্ছে বসে বসে, ওই অলুক্ষুণে হতচ্ছাড়া বইটা এখনো রেখেছ বাড়িতে? বিদায় ক'রে দাও, বিদায় ক'রে দাও ওকে। চলো যাই, একটা রিটার্ন ভিজিট দিয়ে আসা যাক মীনাদের বাড়ি থেকে। সেখান থেকে একেবারে সিনেমাতে। টিকিট কেটে অরুণদা অপেক্ষা করবে আমাদের জন্যে।

খুশি আর আনন্দ টলটল করছে নীলিমার চোখেমুখে, সর্বাঙ্গে। কিন্তু বিভূতির মনে হোলো তা বড় তরল, বড় হাল্কা। শোভন সংযত প্রকাশের অভাবে তাকে রীতিমত অশ্লীল বলে মনে হয়।

নীলিমা হাত ধরে টেনে তুলল বিভূতিকে। শরীরে তার কতখানি নতুন শক্তির সঞ্চার হয়েছে তার পরিচয় দিচ্ছে যেন সে। ওঠ ওঠ, শিগগির জামাকাপড়টা পাল্টে নাও। ওই দেখ, বসে বসে ওকি করেছ? ওই সব রাবিশ শিশি বোতলের স্তুপ তাক ভরে সাজিয়ে রেখেছ যে অত যত্ন ক'রে, ডিসপেনসারি খুলবে নাকি? না ভেবেছ, ওগুলি বাড়ি পর্যন্ত টেনে নিয়ে যাবে? আচ্ছা কাণ্ড তোমার। বাবারে বাবা, দিনের পর দিন কতখানি ক'রে বিষই যে গিলতে হয়েছে ঢকঢক ক'রে। ফেলে দাও, ফেলে দাও ওসব। কী হবে ছাই আর ওগুলি দিয়ে। নাও তৈরি হয়ে নাও তাড়াতাড়ি, আর দেরি কোরো না লক্ষীটি।

দুঃসহ বিরক্তিতে মন ভরে ওঠে বিভূতির। যে রোগকে সে ঘৃণা করত তার আর চিহ্ন নেই নীলিমার শরীরে। ওর শীর্ণ গালে রক্তের

সঞ্চার হয়েছে। নতুন স্বাস্থ্যের আবির্ভাব হয়েছে ওর দেহে। তবু ওর দিকে চেয়ে চেয়ে কেন যেন ঘৃণায় রি রি করতে থাকে বিভূতির সর্বাঙ্গ। মন ভরে যায় অদ্ভুত বিতৃষ্ণায়। কঠিন শুষ্ককণ্ঠে বলে, কি ছেলেমানুষী আরম্ভ করেছ নীলিমা, যাও এখান থেকে, তোমার যা খুশি কর গিয়ে। মেঝে থেকে বইটা আবার তুলে নিল বিভূতি।

নিজের আনন্দের রঙে নীলিমার সমস্ত পৃথিবী এতক্ষণ রঙীন হয়েছিল। ভেসে চলেছিল খুশির স্রোতে। এবার হঠাৎ ঘা খেয়ে নীলিমা স্বামীর দিকে চোখ তুলে তাকাল। এই কি বিভূতির চোখ? আনন্দ নেই, উল্লাস নেই, বিভূতির চোখ কি পাথরে গড়া? ঘৃণায় আর বিরক্তিতে তা যেন বিকৃত আর ঘোলাটে হয়ে উঠেছে। এতক্ষণে মনে পড়ল সম্পূর্ণ আরোগ্য লাভের পর বিভূতি তাকে আর কোনো উপহার এনে দেয়নি। এই ক'দিনের মধ্যে কোনো উৎসাহ জাগায়নি, অভিনন্দন জানায়নি। বিভূতি কি চায় না তাহলে নীলিমা নীরোগ হয়ে উঠুক, পরিপূর্ণ স্বাস্থ্যলাভ করুক। অনাত্মীয়, পাড়াপ্রতিবেশী পর্যন্ত আশীর্বাদ ক'রে গেছে, আনন্দ জানিয়ে গেছে নীলিমা ভালো হয়ে উঠেছে বলে; আর বিভূতি তার স্বামী হয়ে, পৃথিবীতে তার পরম শুভাকাঙ্ক্ষী সবচেয়ে ভালোবাসার পাত্র হয়ে এতে খুশি হতে পারল না? নীলিমার আরোগ্য চায় না, স্বাস্থ্য চায় না, সৌন্দর্য চায় না, তবে কী চায় বিভূতি, কী চায়? নীলিমা কয়েক পা এগিয়ে এলো বিভূতির কাছে, একখানা হাত রাখল বিভূতির কাঁধে, এই শোন।

বিভূতি ঘাড় ফেরাল, বিরক্তিতে কপাল তার কুঞ্চিত হয়ে উঠেছে। আবার? আবার এসেছ তুমি ইয়ারকি দিতে? কিন্তু আমি তো আর তোমার মত নবজন্ম লাভ করিনি যে, উড়ে উড়ে বেড়াব প্রজাপতি সেজে? চিকিৎসা বাবদ অনেক দেনা হয়েছে বাজারে, সেগুলো শোধ

দেওয়ার ভাবনা আমাকেই ভাবতে হবে। কিন্তু বলছি তো, তুমি যাও না, বেড়িয়ে এসোগে যেখান থেকে খুশি।

নীলিমার মুখে অদ্ভুত হিংস্র একটুকরো হাসি, একঝলক তরল বিষ যেন লেগে রয়েছে তার ঠোঁটে, পাগল হয়েছ, তুমিও যেমন, কোথায় আবার যাব বেড়াতে। তার চেয়ে ওদের কাউকে বল বিছানাটা পেতে দিক, আবার শুয়ে পড়ি। তাক থেকে ওষুধের শিশিগুলি নামিয়ে আনো, আর তুমি এসে বস শিয়রের কাছে আগের মত ওই ডাক্তারি বইটা নিয়ে। রোগশয্যাই যে আমাদের ফুলশয্যা। এ ছেড়ে যাবো আবার কোথায়। এই দিব্যি ক'রে বলছি তোমাকে, আমি আর কোনোদিন উঠতে চাইব না।

মহাশ্বেতা

সদ্য চূণকাম করা দেয়ালগুলি শুধু শুভ্রই নয়, শূন্যও। একখানা ফটোগ্রাফ কিংবা ক্যালেণ্ডার পর্যন্ত নেই। একপাশে একখানি তক্তপোশে বিছানা পাতা। সাদা চাদরটা মেঝে পর্যন্ত ঝুলে পড়েছে। পাশেই ছোট একটি টেবিলে দু'একখানা বইপত্র আর একটি ফুলদানিতে কয়েকটি চন্দ্রমল্লিকা। তক্তপোশের উপর পা-ঝুলিয়ে-বসা অমিতার দিকে আর একবার তাকাল চিন্মোহন। ঘরের মতই নিরাভরণ শুভ্র ওর সজ্জা। ভিজে এলোচুল সমস্ত পিঠে ছড়িয়ে পড়েছে, ও যেন কালো শ্লেটের ওপর খড়ি দিয়ে লেখা একটি শ্লোকের স্তবক।

ইচ্ছা করলে এখান থেকেই হাত বাড়িয়ে ওর একখানা হাত চিন্মোহন তুলে নিতে পারে। অমিতা একটুও বাধা দেবে না, একটুও বিস্মিত হবে না। তবু থাক, এই স্তব্ধ গম্ভীর মর্মরমূর্তির সামনে বসে প্রশান্ত মাধুর্যে মন পরিপূর্ণ হয়ে ওঠে, কোনো ক্ষোভ থাকে না, কোনো চাঞ্চল্য জাগে না। রূপের এই অনুভূতি চিন্মোহনের জীবনে নতুন। এতকাল উজ্জ্বল শিখায় নিজেকে আহুতি দিয়ে ছিল আনন্দ। দহনজালায় নিজের অস্তিত্বকে তীব্রভাবে অনুভব করা যেত। কিন্তু অমিতার সঙ্গে পরিচয় না হলে জীবনে মধুর প্রশান্তির এই আস্বাদন আর হয় তো ঘটে উঠত না।

কোনো কোনো দিন চুলের মত সূক্ষ্ম একটু কালো রেখা থাকে, আজ

একেবারে সাদা থান পরেছে অমিতা। তাতে গাম্ভীর্য যেন আরো গাঢ় হয়ে উঠেছে। রিক্ততার মধ্যেই যেন ওর ঐশ্বর্যের পূর্ণ প্রকাশ। একটু চুপ ক'রে থেকে চিন্মোহন ডাকল, শ্বেতা। বেশ আর পরিবেশের সঙ্গে মিলিয়ে ওর নাম দিয়েছে চিন্মোহন, মহাশ্বেতা। স্নিগ্ধ হাসল অমিতা। চিন্মোহনের মনে হোলো ওর হাসির রঙও যেন সাদা একগুচ্ছ যুঁই ফুলের মত। যেমন স্বল্প, তেমনি সুন্দর।

তবু ভালো, আজ আর মহাশ্বেতা নই।

চিন্মোহন বলল, মহাশ্বেতাই তো। আমার দেওয়া নাম যাতে সম্পূর্ণ সার্থক হয় তার জন্যে শাড়ীর প্রান্ত থেকে কালো রেখাটুকু পর্যন্ত তুলে দিয়েছ।

অমিতা কোনো কথা বলল না।

চিন্মোহন বলল, বেশ আমার কোনো আপত্তি নেই, এ বেশ যেদিন নিজে থেকে বদলাবে আমি সে দিনের প্রতীক্ষা ক'রে থাকব। কিন্তু বদলাতে একদিন হবেই।

চিন্মোহন তার চোখের দিকে তাকাতে অমিতা চোখ নামিয়ে নিল। কি যেন আছে চিন্মোহনের দৃষ্টিতে, যাতে সমস্ত অন্তর থর থর ক'রে কেঁপে ওঠে।

বেশ বদলান আর রোধ করা যাবে না একথা অমিতাও জেনেছে। সে সম্ভাবনা দিনের পর দিন মুহূর্তের পর মুহূর্তে, ক্রমেই নিকটতর হয়ে আসছে। বদলাতে হবে। শুধু কি বেশ? জীবনের মূল ধারাই ছুটবে নতুন গতিতে। কিন্তু কেমন হবে সে পথ? কেমন হবে পরিবর্তন। এখনো শঙ্কায় মন দুলতে থাকে, সংশয় সম্পূর্ণ ঘুচতে চায় না। এই পাঁচ বছরের বৈধব্য জীবনের সঙ্গে অদ্ভুতভাবে লেগে গেছে। এ ছাড়া অন্য জীবনের কথা কল্পনাও যেন করা যায় না। কিন্তু যার স্মৃতির জন্যে এই

কৃতজ্ঞতা, সেই মৃত অমূল্যের ওপর মন কি অমিতার আজো তেমনি একনিষ্ঠ আছে? দৈনন্দিন জীবনে বিধবার আচার নিষ্ঠা সে তেমনি মেনে চলেছে, কিন্তু নিজের মনের খবর তো অমিতা জানে। এই শুভ্র বেশবাসের সঙ্গে মনের মিল কই? কত রাত্রে নিঃশব্দে চোখের জল ফেলেছে অমিতা, তবু অমূল্যের মুখ স্পষ্ট ক'রে মনে পড়েনি; সেখানে ভেসে উঠেছে চিন্মোহনের প্রতিমূর্তি। অমিতা আর পারে না, এই অন্তর্দ্বন্দ্ব আর আত্মনিরোধের অন্ত কবে হবে? গোপন কাঁটায় মুহুর্মুহু ক্ষতবিক্ষত হওয়ার শক্তি আর অমিতার নেই। এবার সে শিথিল দেহে নিজেকে সম্পূর্ণ ছেড়ে দেবে। দুর্বার স্রোত যেখানে খুশি তাকে ভাসিয়ে নিয়ে যাক।

তবু ওর চোখের সামনে নিজের মনকে এমন ক'রে উন্মুক্ত ক'রে মেলে ধরবার কি প্রয়োজন ছিল? এর চেয়ে আজীবন প্রচ্ছন্ন থাকতে পারলে, নিজেকে সম্পূর্ণ লুকিয়ে রাখতে পারলে যেন কৃতিত্ব ছিল, আনন্দ ছিল বেশি। দিনের পর দিন পাপড়ির পর পাপড়ি খুলতে থাকবে, তবু তার মনের কিছুতে নাগাল পাবে না চিন্মোহন; অমিতা তেমনি ভেবে রেখে-ছিল। কিন্তু তা হোলো কই। কখন কোন অজ্ঞাত মুহূর্তে একসঙ্গে সমস্ত দলগুলি খুলে গেল, অন্তরের অন্তঃস্থল পর্যন্ত উদ্ভাসিত হয়ে উঠল। ওর চোখের আলোয় কিছুই আর গোপন রইল না।

পর্দার বাইরে থেকে ভুবনবাবু ডাকলেন, অমি মা।

অমিতা হঠাৎ কোনো কথা বলতে পারল না।

চিন্মোহন বলল, আসুন।

ভুবনবাবু ঘরে ঢুকতেই চিন্মোহন চেয়ার ছেড়ে দিয়ে তক্তপোশের এক পাশ ঘেঁষে বসে পড়ল। আর সেই মুহূর্তে সংকোচের সঙ্গে অমিতা আরো খানিকটা সরে বসল। মেয়ের দিকে তাকিয়ে ভুবনবাবু মনে

মনে হাসলেন। ওর বৈধব্যক্লিষ্ট শীর্ণ চেহারায় যেন এক নতুন রঙের ছোপ লেগেছে। বয়স ওর পঁচিশ হতে চলল, গত বছর বি, টি পাশ করে গুরুগম্ভীর হেড মিষ্ট্রেস হয়েছে। বাড়িতেও খাওয়া শোওয়া নিয়ে ওর কড়া শাসনে ভুবনবাবুকে সর্বদা তটস্থ থাকতে হয়। সেই মেয়ের এই বালিকাসুলভ লজ্জা তাঁর চোখে ভারি অপরূপ লাগল। ভুবনবাবু মুহূর্তের জন্যে যেন পলক ফেলতে ভুলে গেলেন। ওর দেহ মনে যেন লাবণ্যের নতুন জোয়ার এসেছে, বাঁচবার নতুন সার্থকতা। দীর্ঘদিনের সংস্কারাবদ্ধ মনকে ধিক্কার দিলেন ভুবনবাবু। এ সম্ভাবনার কথা যদি তাঁর আরো চারবছর আগে মনে পড়ত তাহলে এই ব্যর্থ কৃচ্ছ্র-সাধনে ওর জীবনের এতগুলি দিন এমন ক'রে নষ্ট হয়ে যেত না।

কিছুক্ষণ চুপ ক'রে থেকে চিন্মোহনের দিকে তাকিয়ে ভুবনবাবু বললেন, একটা কথা নিশ্চিত ক'রে জেনে নেওয়া দরকার চিন্মোহন। তোমরা দুজনেই বয়ঃপ্রাপ্ত, সে হিসাবে ভালোমন্দ সমস্ত বোঝাপড়া নিজেরাই ক'রে নিতে পার, মাঝখান থেকে আমার হস্তক্ষেপের অবশ্য কোনো প্রয়োজন নেই,...

চিন্মোহন বাধা দিয়ে বলল, না না তা কেন, অভিভাবক হিসাবে নিশ্চয়ই আপনার অনেক কিছু জানবার থাকতে পারে।

ভুবনবাবু হাসলেন, সে কথা থাক। নিতান্ত শুভাকাঙ্ক্ষী হিসাবেই কয়েকটা কথা স্পষ্ট বুঝতে চাচ্ছি। নতুন কিছু নয়। সেদিন তুমি যখন আমার কাছে কথাটা প্রস্তাব করেছিলে তখন আমি যা জিজ্ঞাসা করে-ছিলাম তার জবাব তো এখনো পাইনি চিন্মোহন।

চিন্মোহন বলল, হ্যাঁ, খোলাখুলিভাবেই আমি সকলের সঙ্গে আলোচনা করেচি। দাদা তো সম্পূর্ণ সমর্থনই করেন। অনেক ক'রে বুঝিয়ে বলবার পর মায়ের সম্মতিও শেষ পর্যন্ত পাওয়া গেছে। হয় তো সেটা

তাঁর সানন্দ সম্মতি নয়, কিন্তু এ ধরনের কিছু কিছু প্রতিকূলতাঁর মুখোমুখি দাঁড়াবার শক্তি অমিতার আছে বলেই আমি জানি। যদি নাই পারেন, তাতেই বা ক্ষতি কি। বর্তমান যুগের বিবাহটা ব্যক্তিগত, পরিবারগত নয়।

ভুবনবাবু এবারো একটু মৃদু হাসলেন, সে কথা সত্য। কিন্তু পরিবার আর সমাজ, কয়েকজন জ্ঞাতি বন্ধু নিয়ে সে সমাজের গণ্ডী যত ছোটই হোক তাকে অস্বীকার করা অত সহজ নয়। জীবনে কিসের যে কতটুকু প্রভাব তার হিসেব কি খুব সহজ চিন্মোহন ?

ভুবনবাবুর কথার শেষের দিকটায় যেন একটু ক্লান্ত করুণ সুর বেজে উঠল। ইতিহাসটা চিন্মোহনের কিছু কিছু জানা। নিজের সম্পর্কিত পিসতুতো বোনকে বিয়ে করেছিলেন ভুবনবাবু। মাত্র এইটুকু অবৈধতায় পরিবারের সঙ্গে আজীবন তাঁদের বিচ্ছিন্ন থাকতে হয়েছে। সেই নিঃসঙ্গ রুক্ষতা তাঁদের দাম্পত্যজীবনকেও স্পর্শ করতে ছাড়েনি।

চিন্মোহন চুপ ক'রে রইল। কোনো কথা খুঁজে না পেয়ে অমিতা বলল, যাই বাবা চা ক'রে আনি।

ভুবনবাবু সম্মতিসূচক ঘাড় নাড়লেন।

সপ্তাহখানেক সময় নিয়েছিল অমিতা। সপ্তাহের শেষে আরো এক সপ্তাহ সময় চাইল। কিন্তু অসহিষ্ণু চিন্মোহন মাথা নাড়ল, না আর সময় তুমি পাবে না। আয়ুর সমস্ত সপ্তাহই তাহলে এমনি একটি একটি ক'রে কাটবে। আর বিলম্ব নয়। যা হয় কালই।

ওর এই অসহিষ্ণুতা মাঝে মাঝে বেশ লাগে অমিতার। আরো বেশি অসহিষ্ণু, বেশি রূঢ় যদি হয়ে উঠত চিন্মোহন, তাহলে অমিতার দায়িত্ব যেন আরো অনেক কমত। তার সমস্ত দ্বিধাসংশয়ের তন্তু নির্দয় হাতে

উন্মোচিত ক'রে ফেলুক চিন্মোহন। অমিতা বাধা দেবে না।
স্থির হোলো বিয়ে হবে রেজেষ্ট্রি করেই, তবু চিন্মোহনের পারিবারিক সন্তুষ্টির জন্যে হিন্দু অনুষ্ঠানগুলিও সংক্ষেপে পালন করা হবে।
লজ্জায় কণ্টকিত হয়ে ওঠে অমিতার মন। আবার সেই অনুষ্ঠানের পুনরাবৃত্তি। কিছুতেই মন সাড়া দেয় না।
একটু চুপ ক'রে থেকে অমিতা বলে, ওগুলি কি না করলেই নয়?
চিন্মোহন বলে, আমার জন্যে ওগুলি নিতান্তই অনাবশ্যক কিন্তু আত্মীয়-স্বজনের জন্যে কিছুটা প্রয়োজন আছে বইকি। তবু জিনিসগুলি যে বিরক্তিকর সন্দেহ নেই! কত যে অসংখ্য মেয়েলি আচারের মধ্য দিয়ে পার হতে হয় তার ঠিক নেই। তবু, চিন্মোহন মিষ্টি একটু হাসল, তবু একবারের অভিজ্ঞতা তোমার যখন হয়েছে তত অসুবিধা হবে না বোধ হয়। কিন্তু ওদের পাল্লায় পড়ে নিতান্ত অনভিজ্ঞ আমার দশাটা কি হবে ভেবে দেখ তো।
হঠাৎ ভারি বিবর্ণ দেখাল অমিতার মুখ। চিন্মোহন বিস্মিত হয়ে বলল, কি হোলো?
ম্লান হাসল অমিতা, কি আবার হবে।
কিন্তু কি যে হয়েছে তা বুঝতে বাকি নেই চিন্মোহনের। অমিতার পূর্বজীবন সম্বন্ধে পারতপক্ষে কোনোদিন কোনো কৌতূহল চিন্মোহন প্রকাশ করেনি, এ প্রসঙ্গ সতর্কভাবে সে বরং এড়িয়েই যায়। তবু কোনো মুহূর্তে তার উল্লেখ মাত্রেই অমিতা যদি এমন আঘাত পায়, এতটা অসহায় বোধ করে, তাই বা কি ক'রে চিন্মোহন সহ্য করবে? বয়স এবং অভিজ্ঞতা কি কম হয়েছে অমিতার যে, তার মন আজো এতখানি স্পর্শকাতর থাকবে।
একটা কথা আজ একটু খোলাখুলিভাবে আলোচনা করতে চাই অমিতা। চিন্মোহনের কণ্ঠ একটু রূঢ় এবং গম্ভীর শোনাল।

বল।

তোমার পূর্বজীবনের প্রসঙ্গ এতকাল সযত্নে দুজনে আমরা এড়িয়েই গেছি। কিন্তু ফল তাতে ভালো হয়নি দেখা যাচ্ছে। এর চেয়ে খোলা-খুলিভাবে আলোচনাই বরং ভালো। বেদনা এবং দুর্বলতার স্থানকে লুকিয়ে রেখে কাজ নেই। অমূল্যবাবুকে তুমি আজো ভুলতে পারনি, এই তো স্বাভাবিক। এজন্যে আমার কোনো ঈর্ষাও নেই ক্ষোভও নেই। আমার শুধু দুঃখ এই, তাঁর কথা আমার কাছ থেকে সম্পূর্ণ লুকিয়ে রাখতে চাও। অন্যান্য প্রসঙ্গের মত তাঁর কথাও তো এমন কি তোমাদের সেই দাম্পত্যজীবনের খুঁটিনাটি কাহিনী পর্যন্তও দুজনে আমরা আলোচনা করতে পারি।

অমিতা অদ্ভুত একটু হাসল, প্লানটা যেমন ভালো তেমনি কৃত্রিম। জীবনকে সবসময় অমন ফরমূলায় বাঁধা যায় বলে কি মনে হয় তোমার?

চিন্মোহন বলল, বেঁধে নিতে পারলে অনেক সময় কিন্তু ভালোই হয়। নিজেদের গড়া যে বাঁধন তাকে ভয় কিসের, সে তো ছন্দের বাঁধনের মত। বিয়েকেও তো লোকে বন্ধন বলে।

মনে মনে যত বিরূপতাই থাক মুহূর্তের জন্যে সকলে মুগ্ধই হলেন। রূপ যেমন আছে, সংযত রুচিও তেমনি। বয়স যতটা বেশি বলে শোনা গিয়েছিল, মুখে ততখানি ছাপ পড়েনি। বিদ্যার সঙ্গে বন্দুকের সঙ্গীনের মত তীক্ষ্ণাগ্র অহংকার উঁচু হয়ে নেই। শুধু চিন্মোহনের সঙ্গেই তার সম্পর্ক নয়, পরিবারের সকলের সঙ্গেই অন্তরঙ্গ হতে অমিতা উৎসুক।

তবু কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই অমিতার মনে অস্বস্তির গোপন কাঁটা কোত্থেকে

এসে বিঁধতে লাগল। মন্দাকিনীকে প্রণাম করতে গেলে তিনি হঠাৎ পা সরিয়ে নিলেন, থাক্ থাক্।

অপ্রতিভভাবে অমিতাকে সরে দাঁড়াতে হোলো।

বাইরের ঘরে শোনা গেল চিন্মোনের বড় ভাই মনোমোহন বিধবাবিবাহ সম্বন্ধে বন্ধুদের কাছে বক্তৃতা করছেন, আমি বেশ ভেবেচিন্তে ইচ্ছা করেই মত দিয়েছি, বুঝলে বন্ধু। এমন সচেতন চেষ্টা ছাড়া বিধবাবিবাহ আমাদের সমাজে প্রচলিতই হবে না। লজ্জা আর সংস্কারের জড়তা এমন জোর করেই ঘুচানো প্রয়োজন।

অমিতা সেখান থেকে তাড়াতাড়ি সরে যায়।

খেতে বসেও অস্বুবিধার অন্ত নেই। পুরুষদের খাওয়া হয়ে গেলে চিন্মোহনের বোন স্বনন্দা আর তার বউদি সরমার সঙ্গে অমিতাকে খেতে দেওয়া হোলো। পরিবেশনের ভার নিয়েছেন সম্পর্কিত এক ঠানদি। বিবাহাদি ব্যাপারে খাটতে যেমন তিনি পারেন তেমনি পারেন কথা বলতে। তাঁর রসনার সরসতার খ্যাতি আছে পাড়ায়।

নিরামিষ আমিষ নানারকমের তরকারি। কিন্তু অমিতা শুধু নিরামিষ তরকারি দিয়েই খেয়ে চলেছে। আমিষ একটাও সে স্পর্শ পর্যন্ত করছে না। ঠানদি তা লক্ষ্য ক'রে বললেন, ওমা নতুন বউ যে মাছের তরকারি একটাও ছুঁয়ে দেখলে না। এত কষ্ট ক'রে রাঁধলুম তো ভাই তোমার জন্মেই।

সলজ্জভাবে অমিতা বলল, আজ থাক।

ওমা থাকবে কেন, সধবার যে রোজ মাছ খেতে হয়।

স্বনন্দা বলল, খান বউদি চমৎকার হয়েছে।

সরমাও বলল, একটা তরকারি অন্তত খাও।

নিতান্ত অনিচ্ছা সত্ত্বে একটুকরো মাছ মুখে দিল অমিতা। কিন্তু সঙ্গে

সঙ্গেই দুঃসহ বিবমিষায় সমস্ত গ্রাসটা সে ঢেলে ফেলল ঝেঝের ওপর। সবাই অবাক হয়ে তার মুখের দিকে তাকিয়ে রইল। লজ্জায় আর অস্বস্তিতে প্রত্যেকটি মুহূর্ত অসহনীয় লাগতে লাগল অমিতার।
ঠানদি কিছুক্ষণ নির্বাক বিস্ময়ে তাকিয়ে ছিলেন। তারপর হঠাৎ কি মনে পড়ে যাওয়ায় তিনি মুখ টিপে টিপে হাসতে লাগলেন। ও তাই বল। তা চিনুর সঙ্গে ভাব তো নাতবউয়ের শুনছি অনেকদিন থেকেই; বিয়ে যে হবে এ তো প্রথম থেকেই জানত। মাছকোচ খাওয়ার অভ্যাসটা তখন থেকে আরম্ভ করলেই তো হোতো। তাহলে আর এমন অসুবিধায় পড়তে হোতো না। সে সব বিধিনিষেধ তো আর সকলের জন্যে নয়।
অমিতা চেয়ে দেখল সকলের মুখে কৌতুকের হাসি ফুটে উঠেছে।

খেয়ে দেয়ে উঠে সুনন্দা বলল, ঠানদি চিরকালই ঠোঁটকাটা মানুষ। তাঁর রসজ্ঞানের তুলনা হয় না। কিন্তু তাঁর রসিকতায় আমার পায়ের তলা পর্যন্ত জ্বলে যায়, এই যা যন্ত্রণা।
অমিতা নীরবে ম্লান একটু হাসল। বাইরের আচার আচরণ নিয়ে এমন আকস্মিক অসুবিধায় পড়তে হবে, নানা অন্তর্দ্বন্দ্বের মধ্যে এ ধারণা তার কিছুতেই মাথায় আসেনি।
সুনন্দা সহানুভূতির কণ্ঠে বলল, গা বমি বমি লাগছে নাকি এখনো? একটা পান খেয়ে দেখুন না বউদি, সেরে যাবে।
অমিতা বলল, পান তো আমি খাইনে।
সুনন্দা হাসল, খান না বলে কি এখনো খেতে হবে না নাকি? আমিই কি সবদিন খাই? কিন্তু নিমন্ত্রণ টিমন্ত্রণের পর পান খেয়ে ভারি চমৎকার লাগে। দাঁড়ান আমি সেজে আনছি, ভালো যদি না লাগে কি বলেছি।

চৌদ্দপনের বছরের কিশোরী মেয়ে। ওর নিজের ভালো লাগার স্রোতে অন্যের অসুবিধাটা ও ভাসিয়ে নিয়ে যায়। স্কুলে এমন অনেক ছাত্রীর সঙ্গে নিত্য পরিচয় হয়েছে অমিতার, কিন্তু নিজের গাম্ভীর্যে সে অটল রয়েছে।

সারাদিনের মধ্যে চিন্মোহনের আর সাক্ষাৎ নেই। ভিড়ের মধ্যে বাইরে বাইরে লুকিয়ে বেড়াচ্ছে; তাকে দেখাই যায় না আর। মনে মনে অমিতা হাসে। এতদিনের সেই সপ্রতিভ চিন্মোহন বিয়ের পর হঠাৎ এমন লাজুক হয়ে উঠলো কি ক'রে।

সন্ধ্যায় সরমা আর সুনন্দা প্রসাধনের নানা উপকরণ নিয়ে বসল, অমিতাকে নিজেদের পছন্দ মত সাজাবে।

বিব্রত হয়ে অমিতা বলল, এসব কেন এত?

সুনন্দা বলল, কেন নয়? আগের মত আজো কি সেই সাদা—

চোখের ইসারায় সরমা তাকে নিষেধ ক'রে বলল, ছি।

অমিতা ছেড়ে দিয়েছে নিজেকে। তাকে নিযে যা খুশি করুক ওরা। অস্বস্তি প্রথমটায় লাগলেও এ ধরনেব অত্মসমর্পনে অদ্ভুত তৃপ্তিও যে একরকম পাওয়া যায় তা যেন বহুকাল পরে আবার নতুন করে অনুভব করল অমিতা। এ যেন আর কেউ, আর কারো শরীর। সুনন্দাদের একজন হয়ে সেও যেন কৌতুক বোধ করছে।

আলতায় দুটো পা একেবারে লেপে দিয়েছে সুনন্দা। কপাল আর সিঁথি নিয়ে পড়েছে সরমা। সিঁদুরের সূক্ষ্ম রেখায় তার তৃপ্তি নেই। নিজের মত ক'রে অমিতার সিঁথিও সম্পূর্ণ সে আয়তির চিহ্নে উজ্জ্বল ক'রে তুলল। কপালে বড় ক'রে এঁকে দিল সিঁদুরের ফোঁটা। কে বলবে বিধবার বেশে পাঁচ পাঁচটি বছর কাটিয়ে এসেছে অমিতা। খাওয়া দাওয়ার পর সুনন্দার পাল্লায় পড়ে এ বেলাও পান খেতে হোলো।

তাছাড়া দীর্ঘদিন পরে হলেও পানের স্বাদটা অমিতার ভালোই লেগেছে।

সাজিয়ে গুজিয়ে স্থনন্দা তাকে ঠেলে নিয়ে দাঁড় করিয়ে দিল নিজের বড় দেয়াল আয়নাটার সামনে, দেখুন কি চমৎকার মানিয়েছে, আমূল বদলে গেছেন একেবারে। নিজেকে নিজে চিনতে পারছেন তো?

মৃদু হাসল অমিতা, না পারাই তো ভালো।

আধো শোয়াভাবে কি একটা বই পড়ছিল চিন্মোহন। অমিতাকে দেখে হঠাৎ যেন চমকে উঠল।

একি হয়েছে?

অমিতাও একটু বিস্মিত হোলো, কেন, কি আবার হবে।

চিন্মোহন যেন নিজের চোখকে বিশ্বাস করতে পারছে না, তোমাকে এমন বিশ্রী সঙ সাজাল কে।

কথার ভঙ্গিটা কেমন যেন দুঃসহ লাগল অমিতার, বলল, কে আবার সাজাবে? আমি নিজেই সেজেছি। কেন খুব খারাপ লাগছে নাকি?

সব্যঙ্গে হেসে উঠল চিন্মোহন, না না না, অতি চমৎকার, অতি চমৎকার। দশ বছর বয়স কমে গেছে তোমার। একেবারে চতুর্দশী বালিকা বধূ।

এই অপ্রত্যাশিত আঘাতে চমকে উঠে চোখ তুলতেই অমিতা দেখতে পেল চিন্মোহনের শিয়রের খানিকটা ওপরে, দেয়ালে টাঙানো দিন কয়েক আগেকার অমিতারই একখানা ফটো। নিচে সযত্ন হস্তে লেখা, মহাশ্বেতা।

স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে রইল অমিতা। এই বিচিত্র বর্ণবাসের অন্তরালে তার মন মরুভূমির রিক্ততায় ধূ ধূ করছে।

কুমারী শুক্লা

একটু দূর থেকেই চূণকামের উগ্র গন্ধটা নাকে আসে। এই ক'দিন আগেই নিজের গরজে শুক্লা বাড়িটার চূণকাম করিয়েছে। বাড়ির যিনি মালিক তিনি থাকেন কাশীতে। মাস অন্তে ভাড়াটা পেলেই হোলো। আর কোনোদিকে তাঁর লক্ষ্য নেই। আর যারা বাসিন্দা, অন্য সব শিক্ষয়িত্রী আর ছাত্রীরা, তাদের নজরও এদিকে ভারি কম; মাথাগুঁজে কোনোরকম ক'রে থাকতে পারলেই তাদের চলে যায়। ভালো লাগে না কেবল শুক্লার। অপরিচ্ছন্ন ঘরে মন তার আরো অপ্রসন্ন, মেজাজ আরো খিটখিটে হয়ে ওঠে। নিজেকেই যেন নিজে সহ্য করা যায় না। গন্ধটা কিন্তু বেশ। ওদের কাছে চূণকামের গন্ধটা কেন যে এত খারাপ লাগে, তা শুক্লা বুঝে উঠতে পারে না; তার তো বেশ লাগে।

এত চেষ্টাতেও বাড়িটার পৌরাণিকতা সবটুকু ঢাকা পড়েনি, তবু বাইরে থেকে এখন শাদা ছোট্ট বাড়িটাকে বেশ ভালোই দেখা যায়। আর এদিকটাই সব চেয়ে সুন্দর শহরটির। একটি কুঁড়ে ঘরকেও চমৎকার মানাত এখানে। কোনোরকম কোলাহল গোলমাল নেই, নেই দোকান-পাটের ভিড়। শহর আগেই যেন শেষ হয়েছে, এটা সীমান্ত—শহর আর গ্রামের। খানিকটা দূরে পূবের দিকে বড় রকমের একটা মাঠ। অবশ্য এখন এই বর্ষার সময় মাঠ বলে মোটেই আর তাকে মনে হয় না। পাটগুলি কেটে নিয়ে যাওয়ায় দিগন্ত পর্যন্ত খালি জলই চোখে পড়ে

কালো রঙের। সাগর কি এমন স্থির নিস্তরঙ্গ? সমুদ্র অবশ্য শুক্লার কোনোদিন দেখা হয়ে ওঠেনি, যদিও সুযোগ মাঝে মাঝে এক আধটু এসেছে, কিন্তু সব সুযোগই কি গ্রহণ করা যায়? মাঝে মাঝে দু'একখানা ধানের ক্ষেত। বেশ লাগে দেখতে। খানিকটা উঁচু সবুজ জমি যেন জলের ওপর ভেসে রয়েছে। সমুদ্রের মধ্যে দ্বীপগুলিও বোধ হয় এমনিই দেখতে।

ঢুকতে না ঢুকতেই ঝি ক্ষীরোদা এসে গেটের সামনে দাঁড়িয়েছে, আপনার দুখানা চিঠি এসেছে বড়দিদিমণি। জানালা দিয়ে আপনার ঘরের টেবিলের ওপর রেখে দিয়েছি।

মিশি-রঞ্জিত ঠোঁটে বিদ্যুতের মত এক ঝলক হাসি খেলে যায় ক্ষীরোদার।

শুক্লা গম্ভীরভাবে বলে, বেশ করেছ। কিন্তু আবার তুমি মিশি ব্যবহার আরম্ভ করেছ ক্ষীরোদা? না, তোমাকে নিয়ে আমি আর পেরে উঠলুম না। আমি তো বলে দিয়েছি, এর চেয়ে তুমি হুঁকো টানো, সেও সহ্য হবে। মনে রেখ, বার বার এই শেষবার।

ক্ষুন্ন হয়ে ক্ষীরোদা পিছিয়ে যায়। বাপরে একেবারে মেম সাহেবের মেজাজ। অনেক জায়গায় সে চাকরি করেছে, কিন্তু এমন বদ্‌মেজাজি মেয়েমানুষ সে যদি আর দুটি দেখে থাকে।

চিঠি। আজও মাঝে মাঝে চিঠি আসে শুক্লার নামে। জীবনে এত চিঠি সে পেয়েছে যে সব যদি রাখত, তা হলে শুধু চিঠি দিয়েই বোধ হয় নিজেকে ঢেকে রাখতে পারত। কিন্তু সত্যি, শুধু চিঠি দিয়েই কি নিজেকে ঢেকে রাখা যায়? কি লাভ চিঠি জমিয়ে জমিয়ে? কাগজগুলি বিবর্ণ হয়ে ওঠে, অক্ষরগুলি আসে অস্পষ্ট হয়ে। বাক্সে, দেরাজে

এনভেলপের বাণ্ডিল রাশের পর রাশ জমে ওঠে। ভাবতে ভালো লাগে, একদিন খুলে দেখা যাবে। কিন্তু খোলা আর হয়ে ওঠে না। তারপর হঠাৎ একদিন সমস্ত জড় ক'রে শুক্লা ছিঁড়ে ফেলে কিংবা পুড়িয়ে দেয়। আর ঠিক পর মুহূর্তেই মনে হতে থাকে, নষ্ট না করলেই বা কি ক্ষতি ছিল ?
তবু নতুন চিঠি পেতে আজও ভালো লাগে। চিঠি। সোনার ঘণ্টার মত আজও মধুর নিক্কনে বাজতে থাকে শব্দটা। কি না থাকতে পারে ঐ শাদা একখানা এনভেলপের মধ্যে ! কত সম্ভাবনা আর বিস্ময়ের বিচিত্র রঙই না বয়ে আনতে পারে ইচ্ছা করলে।

মেয়েদের সাপ্তাহিক পরীক্ষার খাতাগুলি টেবিলের ওপর রেখে ঘরের বাকি জানালা কয়েকটাও শুক্লা খুলে ফেলে। একঝলক হাওয়া এসে টেবিলের ধারের ক্যালেণ্ডারটার পাতা উল্টাতে থাকে পত্‌পত্‌ ক'রে। আলগোছে প্রথম এনভেলপটা শুক্লা তুলে নিল, ওপরের হাতের লেখাটা দেখে একটু চম্‌কে উঠল। এতদিন পরে প্রশান্ত আবার তাকে চিঠি লিখেছে! এনভেলপের কিনারাটা ছিঁড়তে গিয়ে হাতটা একটু হয়ত কেঁপে উঠল। অতি সংক্ষিপ্ত একটুক্‌রো চিঠি। প্রশান্ত লিখেছে, শুক্লা, কুশ্রী ব্যধিতে হাসপাতালে পচে মরছি, এলে শেষ দেখা হতে পারে।
শুক্লা বেশ দৃঢ় হয়ে রইল, বিচলিত হতে নিজের কাছেও সে লজ্জাবোধ করে! যন্ত্রবৎ দ্বিতীয় চিঠিখানাও শুক্লা খুলে ফেলল। চিঠিখানা অমলেন্দুর। এও সংক্ষিপ্ত।
শেষ পর্যন্ত বিয়ে করাটাই ঠিক হোলো, শুক্লা। পণের টাকায় বাবার ঋণের ভার অন্তত খানিকটা তো লাঘব হবে। স্নিগ্ধ সরল কৈশোরের সংস্পর্শে নবত্বলাভের বৃথা আশা তোমার মত আমার নেই, সে চেষ্টা

তুমিও তো করেছিলে। কৌতুকের আর একটা নতুন ক্ষেত্র তো পাব, সেই হোলো আনন্দ। পরম বন্ধু হিসাবে তোমার নিমন্ত্রণ রইল।

ও ঘরটা মেয়েদের কল্লোলে মুখর হয়ে উঠেছে। তার মৃদু গুঞ্জন এদিকেও ভেসে আসছে। প্রতিমার গলা উঁচু হয়ে উঠেছে সব চেয়ে। এতক্ষণ সব মেয়েরা বোধ হয় তাকে ঘিরে দাঁড়িয়েছে। ক'দিনেই মেয়েদের কাছে সে বেশ পপুলার হয়ে উঠেছে। সকলের সঙ্গেই তার সখিত্ব। হাসতেও যেমন পারে, হাসাতেও পারে তেমনি প্রতিমা। এক এক সময় ভাবি ঈর্ষা হয় শুক্লার। সেও যদি নিজেকে অমনি ছেড়ে দিতে পারত, অমনি তরল হয়ে মিশে যেতে পারত সকলের সঙ্গে, কিন্তু শুক্লা বেশ জানে কিছুতেই তা সে পেরে উঠবে না। জোর ক'রে চেষ্টা করতে গিয়ে অনর্থক নিজেকেই সে হাস্যকর ক'রে তুলবে, কাউকে সে হাসাতে পারবে না। তার চেয়ে এই ভালো, ভয় আর শ্রদ্ধার দূরত্ব, সম্মান আর আভিজাত্যের নিঃসঙ্গতা।

শুক্লা জোর করেই মেয়েদের খাতগুলি টেনে নিল। কিছুতেই সে বিচলিত হবে না, তার দৃঢ়তা টলবে না কিছুতে। একটু পরে কবিতা আবৃত্তি করতে করতে সেকেণ্ড টিচার অরুণা ঢুকল ঘরে। এই একটি মেয়ে তাকে কিছুতেই সমীহ করবে না; বিদ্রূপে, পরিহাসে জোর করেই শুক্লাকে সে দলে টেনে নামাবে। মাঝে মাঝে অবশ্য দুঃসহ মনে হয়, কিন্তু একেক সময় বেশ লাগে ওর হাতে নিজেকে ছেড়ে দিতে।

"অস্তরবির রশ্মিআভায়
খোলা জানালার ধারে—"

কুমারী শুক্লা কি করছেন বসে বসে?

শুক্লা একটু হাসবার চেষ্টা ক'রে বলল, কাব্যকাহিনী পাঠ করছেন না—দেখতেই পাচ্ছিস, অঙ্কের খাতা দেখতে হয় আজকালকার শুক্লাকে।

অরুণা বলল, কিন্তু সে কি শনিবারী ছুটির পর? আচ্ছা দাও আমি দেখে দিচ্ছি। খাতা ক'খানা জোর ক'রে তুলে নিতেই খোলা চিঠিখানা চোখে পড়ে গেল অরুণার।

ও বাবা, তবে নাকি কাহিনী নয়? পড়ব শুক্লাদি?

অন্যের জীবন রহস্যের সম্বন্ধে অদ্ভুত কৌতূহল আর অনুসন্ধিৎসা। তার বয়স, শিক্ষা, সুরুচিও তাদের সম্পূর্ণ সংহত করতে পারেনি। অন্যদিন হলে শুক্লা তাকে কঠিন ভর্ৎসনায় লাঞ্ছিত করত, ছিনিয়ে নিয়ে যেত চিঠি, কিন্তু আজ সে নিশ্চল হয়ে রইল। দেখুক ও। রহস্য যখন শেষ হয়ে গেল, তখন আর অনাবৃত করতে ক্ষতি কি। আর অনাবৃত না করেই কি শুক্লা আজ থাকতে পারবে?

আচ্ছা পড়।

অরুণা বলল, না থাক, তুমি হয় তো মনে মনে রাগ করছ।

ম্লান হেসে শুক্লা বলল, না রাগ করছিনে, পড় তুই। একটু পরে শুক্লা আবার অরুণার দিকে চোখ ফিরাল।

কিছু বুঝতে পারলি?

সামান্য। কন্‌টেক্স্ট না হলে কি সবটা বোঝা যায়?

কন্‌টেক্স্ট? আচ্ছা শোন।

নিজেকে নগ্ন করতে আজ অদ্ভুত আনন্দ পাচ্ছে শুক্লা। আমি মনে মনে গুছিয়ে নিচ্ছি। ততক্ষণে তুই দু'কাপ চা কর দেখি। ঐ কোণটায় সব রয়েছে দেখ।

বোর্ডিং-এর মধ্যে চা তৈরিতে সবচেয়ে দক্ষ অরুণা। মিনিট কয়েকের মধ্যেই সে দু'কাপ চা এনে রাখল টেবিলের ওপর। এক কোণায় আর একটা চেয়ারের ওপর একরাশ বই ছিল। সেগুলিকে নিচে নামিয়ে রেখে চেয়ারটা এগিয়ে নিয়ে এল টেবিলের কাছে, দরজাটা দিয়ে এল ভেজিয়ে।

শুক্লা অদ্ভুত একটু হেসে আরম্ভ করল, বুঝতেই তো পারছিস, ঐ দু'জন লোকের সঙ্গে আমার খানিকটা হৃদয়গত সম্পর্ক ছিল।

অরুণা বলল, হ্যাঁ, সেটা দুর্বোধ্য নয়।

বছর দশেক আগে প্রথম পত্রলেখক প্রশান্তের সঙ্গে আমার বিয়ে সম্পূর্ণ ঠিক হয়ে গিয়েছিল। বিয়ের মাসখানেক আগে এমনি একটা ছোট্ট সুন্দর শহরে আমাদের দুই পরিবার পাশাপাশি দুটো বাড়ি ভাড়া নিয়েছিল। পারিবারিক বিরোধহীন আমরা ছিলাম সুখী রোমিও জুলিয়েট। প্রশান্তের ছিল শুধু মা; তিনি তখনো এসে পৌঁছাননি। আমাদের পরিবারও তখন বড় ছিল না; মা, বাবা, ঠাকুরমা আর ছিলেন সোনাকাকা। দিন তারিখ সব জানাজানি হয়ে গিয়েছিল। তার আগে বহুদিন ধরে চলছিল আমাদের মন জানাজানির পালা।

সেদিন কেবল ভোর হয়েছে, বাগানের ধারের ছোট খোলা বারান্দায় ইজিচেয়ারে হেলান দিয়ে আমি দাঁত মাজছি। পেস্টের সাদা ফেনায় মুখ ভরে যাচ্ছে, এমন সময় একটা সাদা গোলাপের তোড়া হাতে প্রশান্ত এসে উপস্থিত হোলো। তোর মতই তখন সারাটা দিন সে কেবল কবিতা আবৃত্তি করত, কিন্তু লিখতে পারত না। ছবি আঁকার হাত ছিল সামান্য, কিন্তু সখ ছিল অসামান্য চিত্রকর হবার। আমার দিকে তাকিয়ে প্রশান্ত হঠাৎ থমকে দাঁড়াল। তারপর চোখ ফিরিয়ে নিয়ে অদ্ভুত কঠিনভাবে বলল, এখান থেকে উঠে গিয়ে দাঁত মাজ শুক্লা। পরিষ্কার দাত দেখতে বেশ ভালো কিন্তু দাত পরিষ্কার করা মোটেই দেখতে পারা যায় না, অত্যন্ত কুৎসিত, ভালগার, বীভৎস।

তুই হাসছিস? গোড়ায় অবশ্য ব্যাপারটা হাসিরই ছিল। আমিও হেসে উঠেছিলাম, ফলে খানিকটা ফেনা লেগে গিয়েছিল অমন চমৎকার শাড়ীটায়। কিন্তু প্রশান্তের রাগ আরো বেড়ে উঠল; চেঁচিয়ে বলল,

হাসছ, লজ্জা করছে না ? এমন নির্লজ্জতা শিখলে কোত্থেকে ? যাও, আমার সামনের থেকে যাও—যাও বলছি······ ।
আমার মেজাজও গরম হয়ে উঠল, ইতরতা আমিও সহ্য করতে পারিনে। বললাম, ভুলে যাচ্ছ যে বাড়িটা আমাদের, ইচ্ছে হলে তুমিই বরং এখান থেকে চলে যেতে পার।
প্রশান্ত বলল, ও আচ্ছা বেশ।
ভাবলুম এই তো স্বাধীনতা। আমাদের স্বাধীনতা দেওয়া, কাল্চারড্ করাটাও ওদের একটা লীলা। আত্মীয়স্বজন বন্ধুবান্ধবদের মধ্যে নিজের পদমর্যদা বাড়াবার জন্যেই শিক্ষিতা স্ত্রী কি প্রণয়িনী ওদের দরকার ? আমাদের যথার্থ শিক্ষা, যথার্থ স্বাধীনতা ওরা চায় না। স্বাধীনতা মানে —ওদের রুচি অনুযায়ী চলা, ওদের নির্বাচিত বই পড়া, ওদের খুশি অনুযায়ী প্রসাধন, ওদের বেছে দেওয়া বন্ধুদের সঙ্গে মেলামেশা। তবু তো স্ত্রী হতে হয়নি এখনো। মনে মনে সংকল্প করলুম কখনো হবোও না।
প্রশান্তও এলো না। ওর আঘাতটা ছিল অন্য রকমের—সেটা অসৌন্দর্যের। আমার সেই মুহূর্তের কুৎসিত মূর্তিটাই ওর মনে চিরস্থায়ী হয়ে রইল। আর ঠিক সেদিনই কাউকে না জানিয়ে ও ক'লকাতা চলে গেল।
ওর মনের ভাবটা বুঝতে আমার দেরি হোলো না। কিন্তু এতকাল যা ভালো লেগেছিল, এই মুহূর্তে ওর সেই কবিয়ানাই আমাকে আরো ক্রুদ্ধ ক'রে তুলল। কি হবে এই দুর্বল কাদার পুতুল নিয়ে ? বাস্তব জগতে কতটুকু ওর মূল্য, কতটুকু নির্ভর করা যাবে ওর ওপর ? আর এই ক্ষণভঙ্গুর কাঁচের আলমারীর মত প্রেম ! অতি সযত্নে, অতি সাবধানে যাকে রাখতে হয় ; রঙীন বুদ্‌বুদের মত যা অবান্তর আর হাস্যকর—কি হবে সেই প্রেম দিয়ে ?

প্রশান্ত এল না। আমি ফটোগ্রাফার ডাকিয়ে দাঁত মাজতে মাজতে ছবি তুললাম, ওকে দেখাবার জন্যে। তবু ও ফিরল না। রঙীন বুদ্‌বুদের মতই ও মিলিয়ে গেল। ভালোই হোলো। ওর নিজের যথার্থ মূল্য এতদিনে টের পাওয়া গেল, নিঃসংশয় হওয়া গেল ওর প্রেমের আয়ু আর সত্যতা সম্বন্ধে। এতকাল যেন কেটেছে খেলায় খেলায়, এখন শক্ত হতেই মজা লাগছে, মজা লাগছে নিজের সঙ্গে যুঝতে, নিজেকে অস্বীকার করতে, গুঁড়ো গুঁড়ো ক'রে ভেঙে ফেলতে আনন্দ লাগছে সেই সাজানো কাঁচের আলমারীকে।

বাবা বললেন, দূর হয়ে যা হারামজাদী, লেখাপড়া শিখেছিস বলেই কি স্বেচ্ছাচারিণী হতে হবে? তা আমার বাড়িতে বসে চলবে না।

মা বললেন, আহা এমন সম্বন্ধটা হাত ছাড়া হয়ে গেল, এই বুড়োধাড়ী মেয়েকে কে শেষে বিয়ে করবে? বাবাকে বললেন, তোমারই তো দোষ। আমি আগেই বলেছিলাম, অত আদর দিয়ো না, সময়মত বিয়ে দিয়ে দাও।

ঠাকুরমা বললেন, তোদের জ্বালায় আমি কি গলায় দড়ি দিয়ে মরব? লোকের কাছে মুখ দেখাবার আর জো রইল না। যেমন ম্লেচ্ছ আচার শিখিয়েছে তেমনই তো হবে? বিয়ের চাইতে এমন উড়ে উড়ে বেড়াবারই ওর ইচ্ছা। এমন তো হবেই, নামটা পর্যন্ত ম্লেচ্ছ রেখেছে। আমি তখনই ছোট খোকাকে বলেছিলুম, ভালো দেখে একটা ঠাকুর দেবতার নাম রাখ। স্বভাবও হবে ওর ঠাকুরদেবতার মত। তা না,—কি একটা নাম রেখেছে শুক্লা না কি মুখেও আসে না ছাই, মুখে আনতে আমি চাইওনে।

নামরক্ষক সোনাকাকা গম্ভীর হয়ে তাঁর আইনের বইতে মন দিলেন। কোনো মন্তব্য করলেন না।

তিন চার বছর পরে দ্বিতীয় সর্গের যখন শুরু তখন আমাদের সংসারের কিছু কিছু পরিবর্তন হয়ে গেছে। সোনাকাকা ওকালতি পাশ করে মহকুমা শহরে গিয়ে বসেছেন, কিন্তু বাসা খরচ প্রতিমাসে উঠছে না। বাবার সামান্য একটু লোভের জন্যে কাস্টমস হাউসের অতদিনের ভাল চাকরিটা তখন গেছে, আর কোনো চাকরি জোটেনি, দেশের বাড়িতে বসে বসে মেজাজ দিনের পর দিন খারাপ ক'রে তুলেছেন, মার সঙ্গে ঝগড়া করছেন, ঠাকুরমার সঙ্গে করছেন বকাবকি। মুখচোরা ভাইকে ওকালতি পড়িয়েছেন বলে অনুতাপ করছেন প্রত্যেকদিন। আর আমি বি টি পাশ করে বর্ধমানে একটা মাস্টারী কেবল পেয়েছি। অবশ্য সুর তখন থেকেই ফেরা আরম্ভ করেছে, সবাই বলছেন—ও ছেলের সঙ্গে বিয়ে না হয়ে আমার ভালোই হয়েছে। ঘরে অমন সুন্দরী বউ থাকা সত্বেও চরিত্র যার ঠিক থাকে না, তার সঙ্গে বিয়ে হলে দুঃখের অবধি থাকত না। এতদিন পরে ওর গুণপনা সব বেরিয়ে পড়ছে। মা আর আমার বিয়ের কথা বলছেন না, কারণ ইতিমধ্যে আমার ছোট একটি ভাই হয়েছে। আমার কাছে বাবার মেজাজ বেশ নরম ; আর ছুটি ছাটায় বাড়িতে গিয়ে দেখি, যদিও দাঁত এখন প্রায় সবগুলিই পড়ে গেছে তবু ঠাকুরমার মুখে আমার নাম বেশ স্পষ্টই উচ্চারিত হয়, একটুও বাধে বলে মনে হয় না।

এমনি সময় ক'লকাতার মেডিক্যাল কলেজে চোখ দেখাতে গেছি, হঠাৎ পিছন থেকে কে ডেকে উঠল, আরে শুক্লাদি যে। চোখ ফেরাতেই চোখাচোখি হয়ে গেল। মুহূর্তের জন্যে চোখ নামিয়ে নিল অমলেন্দু। পরক্ষণেই সোজাসোজি চেয়ে বলল, আপনি এখানে!

চোখ দেখাতে এসেছি। তুমি ?

পড়ছি, এবার থার্ড ইয়ার।

একটু পিঠচাপড়ানো ধরনেই বললুম, বেশ, বেশ।

মামাবাড়ির পাশের বাড়িতেই ওদের বাড়ি। ছেলেবেলায় মামাদের গ্রামে যখন বেড়াতে যেতাম মাঝে মাঝে, ওকে দেখতুম খেলতে। ভারি ডানপিটে ধরনের ছেলে। অল্প বয়সে ও গাছে চড়ায়, নৌকা বাওয়ায় বড় বড় ছেলেদের সঙ্গেও পাল্লা দিত। বয়সে আমার চেয়ে ছোটই ছিল দু'তিন বছরের, পড়তও দু'ক্লাস নিচে। সেই অমলেন্দু এখন মাথায় বেশ বড় হয়ে উঠেছে। বেশ শক্ত স্বাস্থ্যবান চেহারা, দেখে বেশ ভালোই লাগল। চোখ দেখিয়ে চশমা নেওয়ার ওই ব্যবস্থা ক'রে দিল। এই উপলক্ষে দু'তিনদিন আমাকে আসতে হোলো এবং সস্তায় ভালো চশমার জন্যে একদিন বাজার ভরে বিভিন্ন দোকানে ঘুরে ঘুরে বেড়াতে হোলো। চশমা পরের দিনই পেয়ে গেলাম। অনুমান করতে বাকি রইল না—অদৃশ্য এক রঙীন চশমা অমলেন্দুও ইতিমধ্যে পরে বসেছে। কিন্তু অমলেন্দু বেশ চালাক দৃঢ়চরিত্রের ছেলে। সূক্ষ্ম রুচি আর মনের আভিজাত্য ওর প্রচুর, সহজে ধরা দেবার ছেলে ও নয়। আর যা সহজ তা আমিও চাইনে, যদি কিছু গড়ে ওঠে, ভিত্তি হোক তার কঠিন বাস্তবতাপূর্ণ। রঙ নয়, ছবি নয়, কবিতা নয়, শক্ত বাস্তব কিছু চাই। বয়স কম হলে কি হবে, আর পাঠ্যাবস্থা থাকা সত্ত্বেও সংসারের নানা বিষয় ও দেখে, দেশের বিষয় সম্পত্তি সম্বন্ধে ও নিজেই খোঁজ খবর নেয়। ওর বাবা গোঁড়া ব্রাহ্মণ। তিনিও পাকা বৈষয়িক। কিন্তু ও যেন ইতিমধ্যেই তাঁর সঙ্গে পাল্লা দিয়ে চলেছে। তাঁকে ভয় করছে না, স্নেহ করছে। পরে দেখেছিলুম ভয়ের চেয়ে এই স্নেহ আরো কত অসহায়। চায়ের দোকানে চায়ের কাপ সামনে ক'রে যখন আমাদের আলাপ চলত তখন এই সব বৈষয়িক আলোচনাই হোতো বেশি ; ওর বাবার কথা, বিষয় সম্পত্তির কথা, বিভিন্ন বিষয়ে ওর ব্যক্তিগত মতামতের কথা ও জোর দিয়ে বলত। রীতিমত

গন্ধময় আলোচনা, তবু ভালো লাগত, তবু চায়ে চুমুক দেওয়ার কথা মনে থাকত না। মানে—মনে বেশ থাকত, কিন্তু চুমুক আমরা ইচ্ছা করেই দিতাম না। এইটুকু ভান করতে আমরা ভালোবাসতাম। রুপালি চায়ের কাপ থেকে রুপালি ধোঁয়া উঠত মৃদু মৃদু ওপরের দিকে। আমরা চেয়ে চেয়ে দেখতাম, কিন্তু ছুঁতাম না ; অপচয়ের আনন্দ, আভিজাত্যের আনন্দ। কিন্তু একটু একটু ক'রে চা জুড়িয়ে যেত, আমরা জুড়িয়ে যেতাম। হঠাৎ চায়ের কথা মনে হওয়ায় চায়ে একটা চুমুক দিয়ে নিল শুক্লা, বলল, যা, এও তো দেখছি ঠাণ্ডা হয়ে গেছে।

কিন্তু অমন শক্ত চেহারা নিয়েও অমলেন্দু ক্রমে ক্রমে নরম চিঠি লেখা শুরু করল। প্রথম প্রথম ও লিখত, শুক্লাদি। কিন্তু কিছুদিন পরে সম্বোধনটা ও তুলে দিল, আমি মনে মনে হাসলাম। কিন্তু কিছুদিন বেশ লাগল এই সম্বোধনহীন চিঠি। এত বেশি নাম, আর এত বেশি সম্বোধন এর আগে পেয়েছি যে, এখন অনামিকা থাকাটাই নতুনত্ব মনে হোলো। কিন্তু কিছুদিন পরেই আমি লিখলাম, এমন সম্বোধনহীন চিঠি লিখলে সম্বন্ধ কি ক'বে গড়ে উঠবে ? চিঠিটা পোস্ট করার পরমূহূর্তেই অবশ্য মনে মনে অনুতপ্ত হলাম। এত সহজে ধরা দিতে গেলাম কেন ? ও তার জবাবে লিখল, জায়গাটা সাদা থাকলেই তোমার নাম লেখা হোলো বলে মনে হয়। অমন শুভ্র নামের ওপর কখনো রঙ বুলাতে কি ভালো লাগে ?

অমলেন্দুও তা হলে ধরা দিচ্ছে !

ক'লকাতায় আমার দূর সম্পর্কের এক দাদু আছে। বাবার কি রকম মামা হন তিনি। আমি মাঝে মাঝে তাঁর বাড়িতেই গিয়ে উঠতুম। বয়সে বুড়ো হলেও আধুনিকদের সঙ্গে তিনি বেশ পাল্লা দিচ্ছিলেন সব

বিষয়ে—বেশেবাসে ভাষায়। আমার সঙ্গে তিনি সর্বদা ফ্লার্ট করতে ভালোবাসতেন। অমলেন্দুর যাতায়াতে তাঁর কোনো আপত্তি ছিল না, বরং প্রশ্রয় দিয়েই তিনি যেন আনন্দ পেতেন।

একদিন আয়নার সামনে বসে বেণী বাঁধছি, অমলেন্দু হঠাৎ গিয়ে উপস্থিত হোলো, উচ্ছ্বসিতভাবে বলল, মেয়েদের প্রসাধিত রূপের চেয়ে তাদের প্রসাধনের রূপ আরো চমৎকার; শুক্লা, এমন সুন্দর দেখাচ্ছে তোমাকে আজ।

হঠাৎ অনেকদিন আগের কথা আমার মনে পড়ে গেল, হেসে উঠলাম, এই, অত কবিত্ব কোরো না, সব অঙ্গের প্রসাধন সম্বন্ধে বোধ হয় সে কথা বলা চলে না।

অমলেন্দু হঠাৎ যেন আহত হয়ে পিছিয়ে গেল, বলল, ঠিক বলেছ, ভুল হয়ে যাচ্ছিল, রক্ষা করেছ তুমি। কবিত্ব তো আমাদের করবার কথা নয়।

কিন্তু কেন সে আমার কথা মেনে নিতে গেল? কবিত্বের রূপ কি একরকম? কেন সে নতুন করে লিখলে না কবিতা, আঁকলে না নতুন ছবি? শুধু কি আমার নিষেধে? না আরো নানা নিষেধ ছিল তার,—নানা রকমের হিসাব।

তবু দেখাশুনা চলতে লাগল, চলতে লাগল সতর্কভাবে কবিত্ব বাদ দিয়ে। বয়স বাড়তে লাগল, বছরের পর বছর। ও আমার পূর্বের অভিজ্ঞতা ইঙ্গিতে জেনে ফেলল, আমিই ইচ্ছা ক'রে ওকে জানালাম। মিথ্যা মোহ নয়, ছলনা নয়, যা গড়ে ওঠে তা কঠিন সত্যের ওপর গড়ে উঠুক।

একদিন দেখলুম ওর চোখের কোণে ক্লান্তি জমে উঠেছে। বললুম, আর কেন, বিয়ে করে ফেল অমলেন্দু।

অমলেন্দু বলল, কি সাংঘাতিক মেয়ে। এই যদি মনে ছিল, আগে কেন বললে না? কত ভালোভালো দিন গেল পঞ্জিকায়।
উপহাসটা হজম ক'রে বললুম, কি সাহস তোমার এমন কথা মুখে আনতে পারলে? বয়সে দু'বছরের বড় কিন্তু জাতে দু'ধাপ ছোট, কায়স্থের মেয়েকে বিয়ে করবার দিনক্ষণ সারা পঞ্জিকায় কোথাও পাবে না, আমি বলছি, নোলকপরা ছোটখাট কোনো একটি ব্রাহ্মণকুমারীকে গ্রহণ কর।

অমলেন্দু বলল, মাস্টারী করবার মহৎ দোষই হোলো এই যে, স্কুলের বাইরেও সব জায়গাকে নিজের স্কুল আর সব লোককে ছাত্র বলে মনে হয়। উপদেশের প্রবৃত্তিকে রোধ করা যায় না। তারপর আরো দিন কাটতে লাগল, দিনের পর দিন আমরা শুকিয়ে উঠতে লাগলাম, ঠাণ্ডা হয়ে যেতে লাগলাম। আর এই শুকিয়ে ওঠাতেই, ঠাণ্ডা হয়ে যাওয়াতেই যেন বড় কৃতিত্ব, আমাদের বড় প্রতিযোগিতা।
কিন্তু অমলেন্দুকে যখন প্রথম দেখেছিলাম, ভেবেছিলাম ওর মধ্যে আমি নতুন হয়ে উঠব, ওর মুগ্ধ দৃষ্টিতে গ্রহণ করব নবজন্ম। কিন্তু আমি ওকে অজ্ঞাতসারে টেনে নিয়ে এলাম আমার সমান ধাপে, শুষ্কতার মরুভূমিতে, ঠাণ্ডা বরফাচ্ছন্ন মেরুদেশে। জিত আমারই, জোর আমারই বেশি। কি বল? মাংসল, পেশীবহুল দেহই আছে অমলেন্দুর, মনের দিক থেকে প্রশান্তের মতই সে দুর্বল।
শুক্লা থামল।
মাঠভরা কালো জল সন্ধ্যার ছায়ায় আরো কালো হয়ে উঠেছে।

পুনরুক্তি

শুধু চেহারাতেই নয়, কথায়বার্তায় চালচলনেও ত্রিলোকেশবাবুর বয়সের ছাপ এত কম পড়েছে যে, মাস কয়েক একসঙ্গে থাকার পর একদিন তিনি যখন প্রসঙ্গক্রমে বললেন তাঁর বয়স পঁয়তাল্লিশ, আমি বিস্মিত না হয়ে পারিনি। অথচ এই কমবয়সী কলপটা তিনি যে ইচ্ছা ক'রে পরেছেন তাও নয়, তা যেন নিতান্ত সহজভাবে তাঁর দেহ আর মনের সঙ্গে জড়িয়ে গেছে, শারীরিক দিক থেকে তাঁকে কোনো ছুটোছুটি খেলাধুলোর সাহায্য নিতে হয়নি, তেমন আলাপ আলোচনায় কি প্রসঙ্গনির্বাচনেও যুব-সুলভতার পরিচয় দেওয়ার জন্যে তাঁর আগ্রহ দেখিনি।

প্রায় তাঁরই সমবয়সী আমার এক আত্মীয়ের অযাচিত অভিভাবকতায় আমি একবার ক্ষুব্ধ হয়ে ত্রিলোকেশবাবুর সঙ্গে তা নিয়ে আলোচনা করেছিলাম। তিনি আমাকে অবাক ক'রে দিয়ে বললেন, ওটা বয়সের ধর্ম।

বললুম, বয়স আপনিও মানেন নাকি ?

তিনি হেসে বললেন, না মানব কেন ?

তারপর একটু চুপ ক'রে থেকে বললেন, তাকে মানতে হয় না, সে আপনিই মানিয়ে নেয়। বয়স্ক লোকদের যে তারুণ্যের পরিচয় পান একটু ভাল ক'রে যদি লক্ষ্য ক'রে দেখতে শেখেন তাহলে তার গিল্টি করা রূপ ধরে ফেলতে দেরি হবে না। আসলে নকলে বড় মারাত্মক ভেদ, নিখিলবাবু।

ত্রিলোকেশবাবু চুরুট ধরাতে ধরাতে ম্লান একটু হাসলেন।
এতকাল একসঙ্গে আছি, একই ঘরে পাশাপাশি সিটে রাত জেগে কতদিন কত আলাপ আলোচনা করেছি, কিন্তু তাঁর মধ্যেও যে এমন একটি ক্লান্ত বিক্ষুব্ধ মন লুকিয়ে ছিল তা এতদিন লক্ষ্য করিনি। আমি চুপ ক'রে রইলাম।

খোলা ছাতেও রাত্রির অন্ধকার এত ঘন হ'য়ে এসেছে যে, আমরা কেউ আর কারো মুখ দেখতে পারছি না।
কিছুক্ষণ চুপ ক'রে থেকে ত্রিলোকেশবাবু খানিকটা আত্মগতভাবেই বললেন, আমার মুখে এ-সব কথা শুনে আপনি হয় তো বিস্মিত হচ্ছেন, কিন্তু আমি নিজেই কি সেদিন কম বিস্মিত হয়েছিলাম।
তারপর হঠাৎ তিনি বললেন, চলুন উঠি, এবার ঘুমাবার চেষ্টা দেখা যাক। গরমটা অনেক কমেছে।
বললাম, আরো কিছুক্ষণ বসা যাক না ত্রিলোকেশবাবু।
ত্রিলোকেশবাবু হাসলেন, ও, আপনি বুঝি গল্পের গন্ধ পেয়েছেন।
আমিও হাসলুম, তা একটু পাচ্ছি বই কি। আর আপনার উদার দাক্ষিণ্যের ওপর আমার বিশ্বাস আছে।
বটে? তাহলে তো সে বিশ্বাস আর বন্ধুত্বের মর্যাদা রাখতেই হয়। চুপ ক'রে থেকে ত্রিলোকেশবাবু কি ভাবলেন, তারপর বললেন, আচ্ছা, ধরুন এক ভদ্রলোক, বয়স—তা এই আমার মতই—নাম—পাত্রপাত্রীর নামগুলি আপনাকে জোগাতে হবে, নিখিলবাবু, নাম সহসা আমার মাথায় আসে না।
আচ্ছা, সেজন্যে ভাবনা নেই, তবে আপাতত একটা নামের ব্যবহার আমরা বাঁচাতে পারি আপনি যদি উত্তম পুরুষে গল্পটা আরম্ভ করেন।

কথা দিচ্ছি সেটাকে টেকনিক হিসাবেই নেব, আপনার নিখুঁত আত্মজীবনী বলে বিশ্বাস করব না।

আবহাওয়াটা হাল্কা ক'রে দেওয়ায় ত্রিলোকেশবাবু যেন খুশিই হলেন। তরলকণ্ঠে বললেন, করবেন না তো? খুব আশ্বস্ত হলাম। আচ্ছা, শুনুন।

জানেন বোধ হয়, এই ইনসিওরেন্সের অফিসে চাকরী নেওয়ার আগে আমি সেদিন পর্যন্ত আমাদের গাঁয়ের স্কুলে মাস্টারী করতাম। এক হিসাবে এই শহর থেকে নিরুপায় হয়েই গাঁয়ে আমাকে পালাতে হয়েছিল। ইদানীং এই যুদ্ধের আমলের মত না হোক আমরা যখন পাশটাশ ক'রে বেরুই তখন চাকরি ক'লকাতায় মোটামুটি সুলভই ছিল, তবু যে আমি কিছু সুবিধা করতে পারিনি তার কারণ আমার বড়লোক পদস্থ আত্মীয়দের ধারণা আমি অহংকারী, অপরিণামদর্শী, আর আমার দু'চার জন ঘনিষ্ঠ বন্ধুদের মনোভাব আমি ভীরু, দুর্বল, মুখচোরা। খবরের কাগজের কর্মখালির বিজ্ঞাপন থেকে ঠিকানা টুকে রাখতাম। কিন্তু ঐ পর্যন্তই। দরখাস্ত লিখতে আমার গায়ে জর আসত। মনে মনে বহু রিহার্সাল দেওয়ার পর দু'চারজন সাহেবসুবোর সঙ্গে একেক দিন দেখা করতে যেতাম, কিন্তু আলোচনার পর দ্বিতীয়দিন আর ওমুখো হতাম না। চাকরী সংগ্রহের পক্ষে একদিন দেখা করাটা মোটেই যে পর্যাপ্ত নয় সে সম্বন্ধে ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা এতদিনে হয় তো আপনার হয়েছে।

যা হোক, সমস্ত উচ্চাকাঙ্ক্ষা ছেড়ে গাঁয়ের স্কুলে মাস্টারী আর পুত্রকলত্র পরিবৃত হয়ে নির্বিবাদে গার্হস্থ্যজীবন যাপন করছিলাম, এমন সময় এলো দুর্ভিক্ষ। জেলে আর নমশূদ্রদের স্কুল। প্রথম ধাক্কাতেই স্কুল গেল উঠে। তাহলেও ঘরে সংবৎসরের খোরাক আছে, তাই সাধারণ

লঙ্গর খানার সম্পাদক হলাম। স্কুলের চেয়ার ছেড়ে বাড়ির ইজি চেয়ারে গা এলিয়ে দিলাম বিশ্রামের আশায়।
কিন্তু স্ত্রী ছাড়লেন না, স্কুল উঠেছে অথচ আমার ওঠার কোনো লক্ষণ দেখা যাচ্ছে না, তিনি ভয়ংকর বিপদ গণলেন।
চিরটা কালই কি একরকম যাবে? এতখানি চরম হোলো অথচ—
বললুম, আমিও তো তাই ভাবছি, এতখানি বয়স নিয়ে নতুন ক'রে কিই বা আর করতে পারি? স্ত্রী ভ্রূ কুঁচকে বললেন, বাজে কথা রাখো, কিছুরই বাড়াবাড়ি ভালো নয়। কি এমন বয়সটা হয়েছে যে চাকরীর চেষ্টায় বেরুতে পারবে না। এ বয়সে আমার ছোড়দা এখনও বিয়ে পর্যন্ত করেননি জানো?
হেসে বললুম, আপনি বয়সটা যে মুহূর্তে মুহূর্তে তোমার স্থবিধামত ওঠে নামে তা জনতাম না।
কিন্তু বেরুতেই হোলো। সত্যি বসে থাকলে চলবে কি ক'রে, বিঘা কয়েক ধানী জমি থেকে নিতান্ত না হয় খোরাকটাই হয় বছরের, সংসারে আরো তো অনেক কিছুর দরকার।
চলে এলুম ক'লকতায়। দেখা গেল আগে যা পাবতাম না, এখন তা বেশ পারি। দু'তিনটি পদস্থ বন্ধুর সঙ্গে একাধিক দিন দেখা কবলাম এবং তাদের একজনের অফিসে এবং অধীনে চাকরীও নিয়ে ফেললাম। তিনি এখানকার একটা নামকরা ইনসিওরেন্স অফিসের ম্যানেজিং ডাইরেক্টর। স্থতরাং আপনাকে একটা নাম সরবরাহ করতে হবে নিখিলবাবু।
ত্রিলোকেশবাবু যে কোন অফিসে কাজ করেন তা জানি এবং তার ম্যানেজিং ডাইরেক্টরও আমার অচেনা নয়, তাই ত্রিলোকেশবাবুর এই লুকোচুরি ভারি ছেলেমাহুষি মনে হোলো। তবু তাঁর সঙ্গে খেলায় যোগ দিয়ে বললুম, ধরা যাক তাঁর নাম নগেনবাবু।

নগেনবাবু? আচ্ছা বেশ। নগেনবাবু প্রায় আমার সমবয়সী হলেও ধনে পদমর্যাদায় অনেক উর্ধ্বে। অন্য সকলের সামনে তাঁকে নগেনবাবুই বলতে হয় এবং তাঁর সামনেও তাঁর নাম ধরবার প্রয়োজন হয় না।

সেদিন কাজের চাপ ছিল বেশি। অথচ সাড়ে পাঁচটা বাজার সঙ্গে সঙ্গে এ্যাসিসট্যাণ্টটি এমন মুখ কাঁচুমাচু ক'রে ছুটি চাইল যে, না দিয়ে পারলাম না। ঘাড় নিচু ক'রে কি একটা ফাইল দেখছিলাম, কাঁধে চাপড় পড়তে চমকে মুখ তুলে তাকালাম। দেখি নগেনবাবু সামনে দাঁড়িয়ে মুচকি মুচকি হাসছেন, বললেন, আমার ধারণা ছিল দীর্ঘকাল মাস্টারী করলে লোকে বোকা হয়ে যায় কিন্তু তুমি এত সেয়ানা হলে কি ক'রে ?

অবাক হয়ে বললুম, চালাকির কি দেখলে।

এমন ক'রে কাজ দেখাতে আমিও পারতুম না।

কাজ দেখানো! মুখটা হয়ত আরক্ত হয়ে থাকবে, নগেন হাত ধরে আমাকে চেয়ার থেকে টেনে তুললেন, তাছাড়া আবার কি ? আচ্ছা তোমার হিউমার বোধটা কি জীবনেও আসবে না ? হয়েছে, এবার ওঠো, চল আমার সঙ্গে।

কোথায় ?

যোগলক্ষ্মী দেবীর ওখানে।

হঠাৎ ত্রিলোকেশবাবু স্তব্ধ হয়ে গেলেন। বুঝতে পারলাম অসতর্ক মুহূর্তে নামটা তাঁর মুখ দিয়ে বেরিয়ে গেছে। কিন্তু কিছুই যেন হয়নি এমনি সপ্রতিভভাবেই ত্রিলোকেশবাবু আবার বলতে আরম্ভ করলেন।

বিস্মিত হয়ে জিজ্ঞাসা করলাম, যোগলক্ষ্মী দেবীর ওখানে ?

হ্যাঁ, তাঁর হুকুম। এখানে এসেছ অথচ দেখা করনি, এতে তিনি ভারি

দুঃখিত হয়েছেন। তোমারও খুব অন্যায় হয়ে গেছে যাই বল। বিশেষ ক'রে ওঁরা তো তোমার কি রকম আত্মীয়ও শুনেছি।

যোগলক্ষ্মী। খবরের কাগজে এখনো তাঁর নাম মাঝে মাঝে দেখতে পাই। এখনও তিনি দু'একটা শিল্প প্রদর্শনী আর অনাথ আশ্রমের উদ্বোধন করেন, বিভিন্ন রাজনৈতিক নেতাদের স্মৃতি-বার্ষিকীতে উপস্থিত থাকেন, দু'একটা সাহিত্য সভায়ও কি কি বক্তৃতা করেছেন তার সংক্ষিপ্ত বিবরণ কাগজে পড়েছিলাম। কিন্তু আশ্চর্য, আমি তাঁকে কি অদ্ভুত ভাবেই না ভুলে যেতে পেরেছি যে, তাঁর নাম কাগজে পড়লেও সেই সঙ্গে অতীতের কোনো কাহিনী আর আমার মনে পড়ে না। কিন্তু নগেনের মুখে তাঁর নাম উচ্চারিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে স্মৃতির সেই রুদ্ধ দুয়ার হঠাৎ যেন আমার খুলে গেল।

বললুম, থাক না আজ, আর একদনি যাওয়া যাবে।

আর একদিন কেন আবার, গরজটা শুধু তাঁর নয়, আমাদেরও। নতুন একটা ফায়ার ইনসিওরেন্স খোলার কথা চলছে। যোগলক্ষ্মী দেবীর সঙ্গে সেই আলোচনাও হবে। সেদিনও তিনি বেশ মোটা রকমের শেয়ার কিনতেই রাজি ছিলেন, আবার যে কেন পিছুচ্ছেন বুঝতে পারছি না। চলো যে ভাবেই হোক তাঁকে সম্মত করাতেই হবে। এতটা এগিয়ে আর পিছোনো যাবে না, এসো।

তখন বাড়ি ছিল শ্যামবাজারে। সেই পুরোনো বাড়ি ভাড়া দিয়ে বালিগঞ্জে আধুনিক প্রথায় এক নতুন বাড়ি করেছেন যোগলক্ষ্মী। সেই প্রাচীন পরিবেশ কিছু নেই। গেটের কাছে একখানা চেনা মুখও চোখে পড়ল না। তবু আগেকার কথা মনে ওঠায় এতকাল পরে বুকের মধ্যে আজও যেন একটু কম্পন অনুভব করলাম।

বসবার ঘরে এসে দেখলাম সেই পুরোনো আসবাবের সবই যোগলক্ষ্মী

ফেলে আসেননি। দেওয়ালের চারদিক ঘিরে দেশী বিদেশী রাজনীতিক আর শিল্পী সাহিত্যিকদের ছবি। সোফা কৌচের সঙ্গে ঘরের অর্ধেকটা জুড়ে তক্তাপোশের উপর সেই বিস্তীর্ণ ফরাশটাও আছে, কেবল নেই সেদিনের ভিড়। যোগলক্ষ্মী দেবীর বৈঠকখানা যে এত জনবিরল কোনোদিন হতে পারে তা কি কখনও ধারণায় আনা যেত?

চাকর এসে পান সিগারেট পরিবেশন করল এবং জানাল কর্তামা ঠাকুর-ঘরে ঢুকেছেন আর কেউ এলে অপেক্ষা করতে বলেছেন।

নগেন ঠোঁট চেপে বললেন, তবেই হয়েছে, তোমার জন্যেই যত দেরি হোলো। এখন ঠাকুর ঘর থেকে কখন বেরোন তার ঠিক কি?

ঠাকুর ঘর! আগেও অবশ্য যোগলক্ষ্মী ঈশ্বরে বিশ্বাস করতেন। কিন্তু আচার অনুষ্ঠানে সেই বিশ্বাসকে দিনযাত্রায় এমন ক'রে চিহ্নিত ক'রে রাখতেন না। রাজনীতি ছাড়া অন্য কোনোদিকে মন দেওয়ার তাঁর কিছুমাত্র সময় ছিল না। এখন সেই কর্মবহুল, ঘটনাবহুল জীবন থেকে অবসর নেওয়ার পর খানিকটা সময় ঠাকুর দেবতা দিয়ে যদি ভরে তোলবার তাঁর প্রয়োজন হয়ে থাকে বিস্মিত হবার কি আছে?

প্রায় ঘণ্টাখানেক পরে কিছুদূর থেকে তাঁর কথা শোনা গেল। ওদের চা-টা দেওয়া হয়েছে? কেবল পান আর সিগারেট? বুদ্ধি ক'রে চায়ের কথা বলতে পারলিনে? মেয়েটা বুঝি এখনো ফেরেনি, তার সভা সমিতি কি রাত বারটা অবধি চলবে? এদিকে তাঁর পায়ের শব্দ শোনা গেল। সঙ্গে সঙ্গে আমার বুকের শব্দও শুনতে পাচ্ছি। যোগলক্ষ্মী আসছেন।

একটু পরেই তিনি এসে আমাদের সামনে দাঁড়ালেন। কিন্তু এই কি যোগলক্ষ্মী? সেই পূজোর ঘরের পোশাকেই চলে এসেছেন। খাটো গরদের থান পরনে, কপালে তিলকসেবার চিহ্ন পরিস্ফুট। আগেও অবশ্য

একটু পুষ্টাঙ্গীই ছিলেন যোগলক্ষ্মী। কিন্তু এখনকার চেহারার সঙ্গে তার তুলনাই চলে না। মেদমাংসের বাহুল্য গরদের খাটো থানে কিছুতেই বাধা পড়তে চাইছে না। আর কোথায় সেই চুল? সমস্ত মাথাটা সেকেলে ব্রাহ্মণ পণ্ডিতদের মত ছোট ক'রে ছাঁটা। মাথার খাটো আঁচলের বাইরে সামনের দিকের চুলগুলি অধিকাংশই প্রায় সাদা হয়ে এসেছে। আর দু'পাশ দিয়ে কেশহীন স্থূল অনাবৃত ঘাড়ের খানিকটা স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে। মনে পড়ল সমস্ত পিঠ ছেয়ে রহস্যঘন কি চুলই ছিল যোগলক্ষ্মীর। বিধবা হওয়ার পরও দীর্ঘকাল ধরে চুলের তিনি যত্ন নিয়েছেন। শুনেছিলাম একবার তাঁর এক বিধবা ননদ এই নিয়ে তাঁকে শ্লেষ করেছিলেন, দেশের কাজের জন্যে থিয়েটারওয়ালীদের মত চুল রাখাও দরকার হয় নাকি বউ? যোগলক্ষ্মী জবাব দিয়েছিলেন, হয় বৈকি দিদি, দশজনের সামনে আমাকে বেরুতে হয় বলেই তাদের চোখ দুটোর কথাও আমাকে ভাবতে হয়।

আজ ছোট ক'রে ছাঁটা যোগলক্ষ্মীর এই কাঁচাপাকা চুলগুলি দেখে হঠাৎ আমার এক অদ্ভুত কথা মনে হোলো। রাজনীতি ছেড়েছেন বলেই কি যোগলক্ষ্মী এমন ক'রে চুল ফেলে দিলেন, না কাঁচাপাকা চুলগুলির মায়া তাঁকে বাধ্য হয়ে ত্যাগ করতে হোলো বলেই তিনি রাজনীতি ছাড়লেন। মুহূর্তকাল বোধ হয় স্তব্ধ হয়ে ছিলাম। তারপর জীবনে সেই সর্বপ্রথম নির্ভয় নিঃসংকোচে তাঁর চোখের দিকে চেয়ে স্পষ্টকণ্ঠে জিজ্ঞাসা করলাম, কেমন আছেন?

যোগলক্ষ্মী স্নিগ্ধ হাসলেন, ভালো। আমাকে কি কোনোদিন খারাপ থাকতে দেখেছ? তারপর নগেনবাবুর দিকে তাকিয়ে বললেন, অনেকক্ষণ ধরে আপনাদের বসিয়ে রেখেছি বোধ হয়। নগেনবাবু বললেন, না না তাতে আর কি হয়েছে সে জন্যে ভাববেন না।

যোগলক্ষ্মী আবার একটু হাসলেন, আর এখন ভেবেই বা কি করতে পারি বলুন? আপনাদের দেরি দেখে ভাবলুম এই ফাঁকে সন্ধ্যাটা সেরে ফেলি।

নগেনবাবু বললেন, তা বেশ করেছেন, কিন্তু তাড়াতাড়িতে দেবতার অংশে কিছু কম পড়ে না থাকে তাই ভাবছি।

যোগলক্ষ্মীর ঠোঁটের উপর দিয়ে হাসির ঝিলিক খেলে গেল, তাই নাকি? নাস্তিক হলেও দেবতার উপর তো আপনাদের এখনও ভারি মমতা আছে দেখ্ছি। কিন্তু আমার তো ধারণা অংশের হ্রাসবৃদ্ধি নিয়ে তাঁর বেশি দুশ্চিন্তা নেই, যতটা আপনাদের।—দাঁড়ান, প্রসাদের থালা তো ঘরেই ফেলে এসেছি, নিয়ে আসি। ত্রিলোকেশ, তোমার কি খবর আজকাল। ঠাকুব দেবতায় বিশ্বাস করো, না তেমনি নাস্তিকই রয়ে গেছ?

আমার হয়ে নগেনবাবু জবাব দিলেন, সে যাই থাক, তাতে আটকাবে না। আজকালকার নাস্তিকেরা অত বোকা নয়, ঠাকুর দেবতাতেই তাদের আপত্তি, প্রসাদে কোনো আপত্তি নেই। কি বল হে ত্রিলোকেশ?

যোগলক্ষ্মী বেরিয়ে গেলেন এবং একটু পরেই শ্বেত পাথরের ছোট্ট একখানা রেকাবি হাতে ফিরে এলেন। দু'টি সন্দেশ তুলে প্রথমত নগেনবাবুর হাতে দিলেন, তারপর আমার ঈষৎ প্রসারিত হাতের তালু আঙুলে ছুঁয়ে দু'টি সন্দেশ আমার হাতে রাখলেন, বললেন, খেয়ে দেখ, ভীম নাগের চেয়ে নিতান্ত ফেলনা যাবে না বোধ হয়।

নগেনবাবু টীকা ক'রে বললেন, ওঁর নিজের হাতে তৈরি।

কোনো একটা ঘটনার পর সেকালে যোগলক্ষ্মী আমার হাত ছুঁয়ে এমন ক'রে কিছু দিতেন না, আজ এতকাল পরে দেখলাম আমি আবার স্পৃশ্য হয়েছি, কিন্তু কোথায় সেই স্পর্শানুভূতির তীব্রতা? আঙুলগুলি

অত মোটা বলেই কি সেগুলি আমার চর্মের বহিরাবরণে এসে থেমে রইল, তাদের স্পর্শে রক্তের সমুদ্র দুলে উঠল না ?

সন্দেশটা মুখে তুলতে যাব একটু দূরে কার লঘু পায়ের শব্দ শোনা গেল আর আমাদের দোড়গোড়ায় এসে হঠাৎ সেই শব্দ থেমে পড়ল। সন্দেশ সুদ্ধ হাতটা লুকিয়ে সামনের দিকে তাকালাম। আঠার উনিশ বছরের একটি তন্বী সুন্দরী মেয়ে। তার চোখ এবং ঠোঁটের কোণ থেকে কৌতুকের বাঁকা হাসি তখন পর্যন্ত সম্পূর্ণ মিলিয়ে যায়নি।

যোগলক্ষ্মী ততক্ষণে পিছন ফিরেছেন, দস্যি মেয়ে, রাত এই নটার সময়—এতক্ষণে বুঝি তোমার সভা ভাঙলো ?

আমার দিকে তাকিয়ে বললেন, চিন্‌তে পারছো তো ? আমার কনিষ্ঠা নন্দিনী দিল্লী।

বললুম, চেনা একটু কঠিনই। খুব ছেলেবেলায় তো দেখেছি।

দিল্লীর দিকে একবার তাকিয়ে নিয়ে যোগলক্ষ্মী আমার দিকে চেয়ে একটু হাসলেন। সে হাসিতে বাৎসল্যের স্নিগ্ধতা।

বললেন, বলো কি, তুমিও আবার এসব কি মিথ্যাসাক্ষী দেওয়া আরম্ভ করলে ? ও আবার কোনোদিন ছোট ছিল নাকি ? ওর তো ধারণা ও এত বড় হয়েই জন্মেছে, ওকে কি কারো নাইয়ে খাইয়ে দিতে হয়েছে, না কোলে পিঠে ক'রে মানুষ করতে হয়েছে ?

যোগলক্ষ্মীর হাসির সঙ্গে হাসি মিলিয়ে দিল্লীর দিকে সস্নেহ কৌতুকে তাকালাম, কিন্তু মুহূর্তের মধ্যেই আমার ঠোঁটের হাসি মিলিয়ে গেল ; নিজের শৈশবকে ও যদি ভুলে গিয়ে থাকে সে কি এতই অস্বাভাবিক ? ওর দিকে তাকালে অন্য কারোরই কি ওর ছেলেবেলার কথা মনে পড়ে ?

যোগলক্ষ্মী বললেন, আয় ঘরে আয়, এঁকে চিনতে পারছিস্ ? তোর মামীমার মেজদা, ডিঙামানিকের ত্রিলোকেশ চৌধুরী।

দিল্লী ছোট্ট নমস্কার জানিয়ে মৃদু হেসে বলল, ও, আপনার গল্প ছেলেবেলায় অনেক শুনেছি, অনেক পড়েছি।

তারপর হঠাৎ নগেনবাবুর দিকে ফিরে বলল, এই যে নগেনবাবু, অনেকক্ষণ এসেছেন বুঝি। তারপর চিন্ময়ের খবর কি বলুন তো, ও যে কলেজেও আসছে না, এসোসিয়েশন অফিসে রিহার্সেলেও আসছে না, কি হোলো হঠাৎ ওর ?

চিন্ময় নগেনবাবুর বড় ছেলে, ইংরেজী সাহিত্যে এম, এ পড়ছে দিল্লীর সঙ্গে। নগেনবাবু সলজ্জ হেসে জবাব দিলেন, সে বোধ হয় তোমরাই ভালো জান।

দিল্লী বলল, তা একটু একটু জানি। দয়া ক'রে কালই একবার ওকে পাঠিয়ে দেবেন তো, এমন ছেলেমানুষ।

হঠাৎ চমকে উঠলাম, কথাটা আরো যেন কোথায় শুনেছি। যোগলক্ষ্মীর খ্যাতি আর প্রতিপত্তির সঙ্গে উত্তরাধিকার সূত্রে এই অল্প বয়সে দিল্লী কি তার মায়ের সেই বৈশিষ্ট্যকেও আয়ত্ত ক'রে ফেলেছে ? সেই পুরুষ-মানুষকে ছেলেমানুষ বলতে পারার বাহাদুরি ?

তরতর ক'রে সিঁড়ি বেয়ে উঠতে উঠতে দিল্লী আর একবার মুখ বাড়িয়ে বললে, ওকে আসতে বলবেন, আর বলে দেবেন হিরোর পার্ট ওকেই দেওয়া হবে।

তরল মিষ্টি একটু হাসির শব্দ শোনা গেল।

মেয়ের এমন প্রগল্ভতায় জানি না যোগলক্ষ্মীও লজ্জাবোধ করলেন কিনা। আমার দিকে তাকিয়ে অপ্রতিভভাবে একটু হেসে বললেন, বোসো চায়ের ব্যবস্থা ক'রে আসি।

বললুম, চায়ের জন্যে অত ব্যস্ত হচ্ছেন কেন ? আর তার জন্যে আপনার যাওয়ার কি দরকার ?

আর কে আবার যাবে, ঐ মেয়ে করবে চা ? ওর বাথরুম থেকে বেরুতে বেরুতেই রাত দশটা, আমিই পারব ! এক কাপ চা ক'রে আনতে পারব না এমনই কি অথর্ব হয়ে গেছি ভেবেছ ?

চা এল। যোগলক্ষ্মী খুঁটে খুঁটে আমার পারিবারিক অনেক সংবাদ জিজ্ঞাসা করলেন। কেমন আছে কল্যাণী ? কেমন আছে ছেলেমেয়েরা ? বড় ছেলের বয়স কত হোলো ? বললুম, বছর তেরচোদ্দ হোলো বোধ হয়। যোগলক্ষ্মী বললেন, বোধ হয় ! এখনও তেমনি আছ, সংসারে কিছুরই সঠিক খবর রাখো না, ভাই বোনে কটি হোলো ওরা ?

এবার সুনিশ্চিত জবাব না দিয়ে উপায় রইল না।

একটু চুপ ক'রে থেকে যোগলক্ষ্মী বললেন, আমি সব শুনেছি নগেনবাবুর কাছে, সেই বুড়ো বয়সে ক'লকাতায় তো এলেই শেষ পর্যন্ত, কিন্তু সময় থাকতে এলে না। ওই সব মাস্টারি টাস্টারিতে কি আর চলে ?

যাওয়ার সময় যোগলক্ষ্মী দোর পর্যন্ত এগিয়ে দিয়ে বললেন, এসো কিন্তু আর একদিন। তারপর নগেনবাবুর দিকে তাকিয়ে বললেন, আচ্ছা আমার আগের কথাই ঠিক রইল নগেনবাবু, দেবতাকে যা মানত করি অবস্থা ভেদে তার বরং হ্রাসবৃদ্ধি চলে। কিন্তু আপনাদের বেলায় তো আর তার জো নেই, একটু কম হলেই আপনারা জোর চালান। কিন্তু সকলের সাধ্য কি সমান ? গরীব বিধবার টাকাগুলো তো জলে যাবে না নগেনবাবু ?

না না, কি যে বলেন, আপনার মুখে ও কথা মানায় না, দেখছেন তো বাজার ? দ্বিগুণ চতুর্গুণ হয়ে ফিরে আসবে।

একটু থেমে হঠাৎ ত্রিলোকেশবাবু বললেন, চলুন এবার বেশ ঠাণ্ডা হাওয়া দিচ্ছে, এখন হয় তো ঘুম আসবে।

আমি হেসে বললাম, কাহিনী শেষ না হলে শুধু কি আমারই ঘুম আসবে না ভেবেছেন ?

ত্রিলোকেশবাবু তবুও চেয়ারে হেলান দিয়ে চুপ ক'রে রইলেন। এতক্ষণে সত্যিই ঠাণ্ডা হাওয়া আসছিল। কিছুক্ষণ অপেক্ষা করার পর মনে হোলো ত্রিলোকেশবাবু সত্যিই আজ আর কিছু বলবেন না। উঠব কিনা ভাবছি ত্রিলোকেশবাবু বললেন, আচ্ছা শুনুন। বাকিটা না শুনলে আপনি যখন নিজে নিজে না বানিয়ে ছাড়বেন না তখন আপনাকে বলাই ভালো।

হিরো হতে চিন্ময়ের কিছু দেরি লেগেছিল। অবশ্য তার কৃতিত্ব এবং দায়িত্ব কেবল আমারই নয়, দিল্লীর স্বভাবেরও। আগেই বলেছি জিনিসটা তার মার কাছ থেকে পাওয়া। মতের দিক থেকে যোগলক্ষ্মীর সঙ্গে ইদানীং দিল্লীর কোনো কিছুরই মিল ছিল না, না রাজনীতিতে, না ধর্মমতে, না সাহিত্যবিচারে। কিন্তু স্বভাবে যেন কোথায় খানিকটা সাদৃশ্য ছিল। এমন কি আমার মাঝে মাঝে মনে হয় যোগলক্ষ্মী এ যুগে জন্মালে ঠিক দিল্লীর মতই হতেন, তাঁর নীতিজ্ঞান এবং রাজনীতি হয় তো এমনি রূপান্তর গ্রহণ করত। সহকর্মী এবং সমবয়সী ছেলেদের সম্বন্ধে দিল্লীর মনোভাবটা ঠিক সেকালের যোগলক্ষ্মীর সঙ্গে তুলনা করা চলে। দিল্লীর কাছেই শুনেছি ছেলেবেলা থেকে তার মা তাকে সাধারণত নিজের এবং নিজের প্রবীণ বন্ধুদের সাহচর্যে রেখেছেন। তাদের আলাপ আলোচনা চালচলনেই দিল্লী অভ্যস্ত হয়ে এসেছে। ম্যাট্রিক পাশ করার পর থেকে যোগলক্ষ্মী অবশ্য আর মেয়েকে নিজের গণ্ডীর মধ্যে বেঁধে রাখতে পারেননি। ভিন্ন মত, ভিন্ন রুচি এবং বিভিন্ন রকমের বন্ধু সে সংগ্রহ করেছে। আমার যতটা বিশ্বাস কৈশোরেই প্রেম সম্বন্ধে তার কিছু না কিছু অভিজ্ঞতা হয়েছিল যাতে কোনো কোনো বন্ধুর সানুরাগ মনোভাব

তার কাছে পরিহাসের বস্তু হয়ে উঠেছিল। বিদ্যা বুদ্ধি থাকা সত্বেও সমবয়সীরা তার কাছে সবাই ছেলেমানুষ, যেন নিতান্তই কৌতুকের পাত্র।

প্রথম প্রথম আমিও দিল্লীর কাছে কৌতুকের বিষয়ই ছিলাম। যেন প্রাগৈতিহাসিক কিম্ভূতকিমাকার কোনো জন্তু এবং তার জন্যেই জীব-তাত্ত্বিকদের কাছে নিতান্ত মূল্যবান। তার বহু বন্ধুর সঙ্গে আমাকে সে এই ভাবে পরিচয় করিয়ে দিয়েছে, ইনি সেই ত্রিলোকেশ চৌধুরী। এক সময় আনক্যানি গল্প লিখে খুব নাম করেছিলেন।

তবু আমাকে দিল্লীর যদি ভালো লেগে থাকে সে কেবল আমার সঙ্গে তর্ক করবার জন্যে। আর লেখা ছেড়ে দেওয়ার পর থেকে আমারও তর্ক করবার শক্তি না হোক আসক্তি বেড়েই গিয়েছিল। বিতর্কটা প্রায়ই হোতো সাহিত্য সংক্রান্ত। দিল্লীর বক্তব্য ছিল আমরা, এই ত্রিলোকেশ চৌধুরীরা, সাহিত্যে কিছুই করতে পারিনি। কেবল মধ্যবিত্ত যৌনজীবনের বিকৃতি, ছোট ক্ষোভ, ছোট ঈর্ষা—এরই উপর কারিকুরি করেছি। আধুনিক সাহিত্যের নমুনা হিসাবে আমাকে মাঝে মাঝে তার নিজের এবং বন্ধুদের কবিতা গল্প পড়ে শোনাত। কিন্তু আমি যে তেমন রসগ্রহণ করতে পারছি না এটা বুঝতে তার দেরি হোতো না। সঙ্গে সঙ্গে সে অত্যন্ত অসহিষ্ণু হয়ে উঠত, এ আপনার ঈর্ষা, নিজে লেখা ছেড়ে দিয়েছেন বলে কারোর লেখাই আপনার সহ্য হয় না। আপনাকে দিয়ে আবার লেখাতে হবে, তাহলে বুঝবেন লেখা কত কঠিন।

লেখার কাঠিন্য তাহলে তোমরাও মানো।

এই সেরেছে। আপনি এবার নিশ্চয়ই দৈবী ইন্‌স্‌পিরেশনের কথা এনে ফেলবেন।

দৈবী না হোক মানবীয় ইন্‌স্‌পিরেশনে তো আপত্তি নেই।

আছে বৈ কি, কথাটার এসোসিয়েশনই খারাপ। কোনো লেখক যখন বলেন· আজকাল আর লিখতে পারছিনে—আমার ভারি হাসি পায়। লিখতে না পারাটা কি ক'রে সম্ভব যখন ছেলেবেলার অক্ষর পরিচয়টা আমরা চেষ্টা করেও ভুলতে পারিনে? আমার তো বরং একেক সময় দেখে দারুণ বিস্ময় লাগে যে, যাই কিছু না লিখি তারই কোনো না কোনো মানে হয়ে যায়, কি অদ্ভুত! শুধু অক্ষরের পর অক্ষর সাজিয়ে গেলেই হোলো।
দিল্লীর শেষের কথাগুলির মধ্যে এমন একটা আন্তরিক উল্লাস ছিল যে সহসা কোনো প্রতিবাদ করতে আমার বাধল।
একটু চুপ ক'রে থেকে দিল্লী বলল, আপনাকে কিন্তু আমাদের কাগজে সামনের মাসে লিখতে হচ্ছে। আমি কথা দিয়েছি।
বললুম, তার চেয়ে তোমাদের লেখার প্রশংসাও বরং আমার পক্ষে সহজ। কথাটা ভুল করেছ। লেখা ছেড়ে দিলেই বরং ঈর্ষা আর অহমিকা ছাড়ে, অন্যের লেখার রসগ্রহণে সুবিধা হয়। কেন না প্রত্যেক লেখকেরই ধারণা একমাত্র তার কাছেই কলালক্ষ্মী ধরা দিয়েছেন।
দিল্লী হাসল, আপনি তাহলে উদার হওয়ার জন্যেই লেখা ছেড়েছেন, যাক্, উদ্দেশ্যটা অন্তত মহৎ।
শুধু উদার নয়, সহজ হওয়ার জন্যেও। কি লাভ বৃহৎ পৃথিবী থেকে নিজেকে বঞ্চিত ক'রে। চারদিকের লোক চলে ফেরে হাসে কাঁদে, নিজের প্রয়োজনে নিজের আনন্দে তারা বাঁচে। আর কলম নিয়ে আমরা ছুটি তাদের পিছনে পিছনে। কতটুকু আমরা তাদের দেখতে পারি, কতটুকু গ্রহণ করতে পারি, নিতান্ত যতটুকু আমরা লিখতে পারব। আমাদের লেখার ভঙ্গির সাথে দেখার ভঙ্গি এক হয়ে যায়। দিনের পর দিন রাতের পর রাত পৃথিবী রং বদলায় আর আমি কেবল কাগজের ওপর কথা কাটি আর কথা বদলাই।

দিল্লী একদৃষ্টিতে আমার মুখের দিকে তাকিয়ে ছিল, আমি হঠাৎ থেমে যেতে সে চোখ নামিয়ে নিল। তারপর হেসে বলল, নিষ্ফলতার ওপরে এমন ক'রে রং ফলাতে আপনার মত আর কেউ পারবে না।
ওর মুখের দিকে তাকিয়ে হঠাৎ আমার মনে হোলো রং কি কেবল জীবনের নিষ্ফলতার ওপরই লেগেছে ?

মাঝে মাঝে আমার সঙ্গে ও বেড়াতে বেরোত। কদাচিৎ কোনোদিন সিনেমায়ও যেতাম। কখনো কখনো চিন্ময় থাকত, কোনোদিন বা যোগলক্ষ্মী, কোনো কোনোদিন আবার কেউই থাকত না। সিনেমা দেখে এসে দিল্লী নিন্দা করত এবং আমার সঙ্গে তার মতের অমিল হোতো না।
এমনি ক'রে আরও কিছুদিন কাটল। দিল্লী মাঝে মাঝে তাদের এসোসিয়শনে নিয়ে যাবার জন্যে আমাকে প্রায়ই জোর জবরদস্তি করত কিন্তু সেখানে যাওয়ার কল্পনায় আমি তেমন স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করতাম না।
দিল্লী বলত, যাচ্ছেন না কেন জানি। আচ্ছা, আমার বন্ধুদের সামনে আপনি অত নার্ভাস ফিল্ করেন কেন ? ওদের সামনে আপনার কথার ধারও যেমন কমে, রংও তেমনি ফিকে হয়ে আসে।
তাই নাকি, কিন্তু তাতে তোমার বন্ধুদের বা তোমার কোনো ক্ষোভের কারণ তো দেখি না। জয়ের আনন্দের ভাগ তুমিও তো পাও, না পাও না ?
দিল্লী অন্যদিকে তাকিয়ে বলল, কেন পাব না ?
তার সমস্ত মুখ যেন আরক্ত হয়ে উঠল।
আর সেই রক্তিম সুন্দর মুখের দিকে চেয়ে মুহূর্তের জন্যে নিজের অকৃতার্থতার গ্লানিতে আমার সমস্ত অন্তর ভরে গেল।

বোধ হয় মুহূর্তকাল দু'জনেই চুপ ক'রে ছিলাম। যোগলক্ষ্মী ঘরে এসে উপস্থিত হলেন। এটা যোগলক্ষ্মীর লাইব্রেরী ঘর। তাঁর স্বামী ভুবনবাবুর ছেলেবেলা থেকে বই কেনার ভারি সখ ছিল। বই কিনবার বা পড়বার দিকে যোগলক্ষ্মীর যে বিশেষ ঝোঁক ছিল তা নয়। কিন্তু স্বামীর অনেক সখের মত এ সখটাকেও এমন আত্মগত ক'রে নিয়েছিলেন যে, তাঁর মৃত্যুর পরও বহুকাল ধরে তিনি কিছু কিছু বই কিনে এই পারিবারিক লাইব্রেরীটিকে মূল্যবান ক'রে তুলেছেন। চারদিক ঘিরে সারি সারি কাঁচের আলমারি আর তার ভিতরে অসংখ্য বইয়ের স্তূপ ঘরটির মধ্যে স্তব্ধ গাম্ভীর্য এনে দিয়েছে।

যোগলক্ষ্মী বললেন, সমস্ত বাড়ির মধ্যে এই ঘরটিতে এসে কি যে শান্তি পাই তা বলতে পারিনে। ইচ্ছা করে দিনের পর দিন এখানে লুকিয়ে থাকি।

কি মন্তব্য করা যায় ভেবে পেলাম না। দিল্লীও দেখলাম চুপ ক'রে রয়েছে। একটু থেমে যোগলক্ষ্মীই আবার কথা বললেন।

আজ আবার কি তর্ক হচ্ছিল তোমাদের ?

বললুম, দিল্লী বলছিল ওর বন্ধুদের সঙ্গে আমি নাকি মন খুলে আলাপ করি না।

দিল্লী জোর ক'রে সপ্রতিভ হতে চেষ্টা করল।

যেন ইচ্ছা করলেই উনি করতে পারেন। করেন না মানে, করতে পারেন না। তোমার এই বন্ধুটির মত নার্ভাস লোক আমি আর দুটি দেখিনি মা। কি ক'রে যে তোমাদের বন্ধুত্ব হয়েছিল আমি ভেবে পাইনে। তোমাদের মধ্যে কোনোদিক দিয়েই তো কোনো মিল নেই।

আড়চোখে একবার তাকিয়ে দেখি যোগলক্ষ্মীর গৌরবর্ণ মাংসল মুখখানা লাল টক্‌টক্ করছে। কিন্তু দেখতে না দেখতেই তা আবার ছাইয়ের মত

পাণ্ডুর হয়ে গেল। দিল্লীর কথার মধ্যে যেন একটু বেশি রকম ঘনিষ্ঠ সুর ছিল। আমার কানেও তা ধরা পড়ল। মনে হোলো তার ঐ ভঙ্গির প্রতিবাদ করা উচিত। কিন্তু কিছুতেই যেন কথা খুঁজে পেলাম না। এও মনে হোলো যাই কিছু বলতে যাব, তাই অত্যন্তরকম নাটকীয় হয়ে উঠবে। কিন্তু আমি যা পারিনি যোগলক্ষ্মী তা অবলীলায় পারলেন। দিল্লীকে তিনি এমনভাবে ধমক দিলেন যে, সে যেন নিতান্তই সাত আট বছরের একটি খুকি। বললেন, হয়েছে, হয়েছে। লেখাপড়া শিখে ভারি পণ্ডিত হয়েছ কিনা। আমার বন্ধুদের সমালোচনা না করলে চলবে কেন?

দিল্লী বোধ হয় এমনটা প্রত্যাশা করেনি। আমিও নয়। ক্রোধে এবং লজ্জায়, খানিক আগে তার মা'র মুখ যেমন দেখাচ্ছিল দিল্লীর মুখও তেমনি হয়ে উঠল। কিন্তু পরক্ষণেই সপ্রতিভ পরিহাসের সুরে সে বলল, বন্ধুদের নিন্দা শুনলে মেজাজ আর ঠিক রাখতে পার না বুঝি। কথায় কথায় আজকাল এমন ক্ষেপে যাচ্ছ যে, আমার ভয় হচ্ছে এতদিনে সত্যি তুমি বুড়ো হয়ে পড়লে। বোসো, একটু চায়ের ব্যবস্থা করা যায় কি না দেখি। গরম চা না হলে তোমার মেজাজ আজ আর ঠাণ্ডা হবে না।

দিল্লী উঠে যাওয়ার পরও একমুহূর্ত যোগলক্ষ্মী গম্ভীর হয়ে রইলেন, তারপর কণ্ঠকে যথাসাধ্য প্রসন্ন এবং সহজ করতে চেষ্টা ক'রে বললেন, আচ্ছা ত্রিলোকেশ।

আমি তাঁর চোখের দিকে সহসা তাকাতে পারলাম না। সেদিন ভেবেছিলাম আর কোনো ভয় নেই, আর কোনো সংকোচ নেই আমার, কিন্তু তখন কি জানি নতুন ভয়, নতুন লজ্জা এমন ক'রে সঞ্চিত হয়েছিল।

বলুন।

আমি ভাবি কি ক'রে তুমি এতদিন মাস্টারি করলে, ছেলে মেয়েরা দুষ্টুমি করলে আচ্ছা ক'রে একটা ধমকও দিতে পার না ?
কথাটা কেবল যেন তিরস্কার নয়। তা হলে কি এত মধুর শোনাত ? মনে পড়ল কল্যাণীও যেন ঠিক এই ভঙ্গিতে অনুযোগ করে।
বললুম, ধমক কি আর সকলের গলাতেই মানায় ? কারো কারো ধমক এমন হয় শুনতে যে, ছেলেদের কাছেও তা ভয়ংকর না হয়ে হাস্যকর হয়ে ওঠে।
কথা শুনে যোগলক্ষ্মীও হাসলেন, তবু আড়ালে আডালে একটু একটু চর্চা কোরো, না হলে ছেলেমেয়েরাই একদিন ধমকাবে দেখো।

কিন্তু যোগলক্ষ্মীর ধমক খেয়েও দিল্লী ফিরল না। বরং ধমক খেয়েছে বলেই সে যেন আরো বেড়ে উঠল। আমি যত তাকে এডাতে চেষ্টা করি, নানা কাজে আমাকে তত তার প্রয়োজন পড়ে। এটা যে যোগলক্ষ্মীর ওপর তাব জেদ সে সম্বন্ধে আমার কোনো সন্দেহ ছিল না, তবু একেবারে নিঃসন্দেহ হতেই কি ইচ্ছা করত ?
দলের বন্ধুবান্ধবদের নিয়ে দিল্লী একটা কাগজ বের করত। এবং বলা বাহুল্য সেই ছিল তার সম্পাদক, এই কাজে সহায়তা করবাব জন্যে আজ-কাল প্রায়ই আমার ডাক পড়ে।
একদিন বললুম, কিন্তু পরামর্শটা হয়ত তোমাদের দলে কু-পরামর্শ বলেই গৃহীত হবে, কেন মিছামিছি তোমাব বন্ধুদের ক্ষুণ্ণ করবে দিল্লী ?
ভাববেন না, আমার বন্ধুরা আপনাব মত সহজে ক্ষুণ্ণ হবাব পাত্র নয়। তারপর দিল্লী একটা লেখা বের ক'বে একটু মুচকি হেসে বলল, তাই বলে এটা কিন্তু অমনোনীত ক'রে বসবেন না। এ কেবল আমাব বন্ধুদেব ক্ষুণ্ণ করা নয়, বুঝেছেন ?

নাম নেই তবু লেখার ধরনে বুঝতে পারলুম গল্পটা দিল্লীর নিজের, শুধু তাই নয় ইদানীং আলাপ আলোচনায় যে সব কথা বলেছি তার অধিকাংশই দেখি রচনাটির মধ্যে স্থান নিয়েছে। এমন কি আমার বলবার ভঙ্গিটি পর্যন্ত যেন অক্ষরে অক্ষরে গাঁথা। লিখতে পারি না বলে আর যেন কোনো ক্ষোভ আমার রইল না। মনের কথা কলমের আঁচড়ে ফুটিয়ে তোলার কষ্ট এবং আনন্দের সঙ্গে এতকাল পরিচয় ছিল, কিন্তু অন্য কারো লেখায় তার নিখুঁত প্রতিবিম্ব পড়লে যে অনুভূতি মনের মধ্যে তীব্র হয়ে ওঠে তার সাক্ষাৎ জীবনে এই প্রথম পেলাম।

বললুম, করেছ কি, ধরা পড়ে যাবে যে।

দিল্লী বলল, অতই কাঁচা মনে করেছেন বুঝি? ধরা পড়বার ভয় তো কেবল একজনের কাছে? আগে ভাগে তাকেই যদি ধরিয়ে দিই—

চক্রান্তটা ঠিক ধরতে পারছি না।

দিল্লী মুচকি হেসে বলল, গল্পটা আপনার নামে ছাপব।

সন্ত্রস্ত হয়ে বললুম, পাগল নাকি? এমন কাজও কোরো না।

দিল্লী বলল, ধরা পড়বার ভয় তা হলে কেবল আমারই নয় দেখা যাচ্ছে।

ভয়! ভয়ের কথা তখন পযন্ত আমার মনেই আসেনি কিংবা এলেও সন্তর্পণে তাকে পাশ কাটিয়ে গিয়েছি। প্রৌঢ়ত্বের সীমান্তে এসে নতুন কোনো ভয় নতুন কোনো ঝুঁকি নেওয়ার মত প্রবণতা মনের আর থাকে না। অভ্যস্ত দিনযাত্রার ফাঁকে যদি কোনো নতুন বিস্ময়ের সন্ধান মেলে তাকে নিরাপদ মসৃণতায় শোধন না করা পর্যন্ত পরিপূর্ণভাবে উপভোগ করা যায় না।

সংসার চিন্তা এবং অফিসের ক্লান্তিকর খাটুনির পর অবসরটা এ ধরনের বিশ্রম্ভালাপে বেশ কাটছিল। মনে মনে এই আশাই হয় তো ক'রে

রেখেছিলাম চিরকাল এমনি করেই কাটবে। এই পরিমিত স্বল্প সময়টুকু ভরে একটি সূক্ষ্ম রসধারা অনন্তকাল ধরে বয়ে চলবে, তাতে কোনোদিন ঝড় উঠবে না প্লাবন আসবে না, ভয় করবার কিছু থাকবে না।

যোগলক্ষ্মী মাঝে মাঝে বন্ধুদের সঙ্গে তাস খেলতেন। এই বয়সেও তাসে এমনভাবে মত্ত হয়ে যেতে দেখে আমি বিস্মিত না হয়ে পারতুম না। খেলাটা যেন তাঁর কাছে কেবল খেলাই নয়, কাজের মতই গুরুতর ছিল। খেলার ভুল হলে তার ব্যঙ্গ আর তিরস্কারের হাত থেকে হতভাগ্য সঙ্গীর ত্রাণ পাওয়ার যো ছিল না। আমি মাঝে মাঝে দর্শকের দলে গিয়ে বসতাম, যোগলক্ষ্মীর রাজনৈতিক জীবনের সঙ্গে কোনোদিন যেমন আমার যোগ ছিল না তেমনি তাস খেলাতেও তাঁর সঙ্গী হওয়ার সৌভাগ্য আমার কোনোদিন হয়নি।

তাসের আসরে সেদিন যোগলক্ষ্মীর বিশেষ বিশেষ বন্ধুর সমাগম হয়েছিল। নগেনবাবু ছিলেন। এলাহাবাদ থেকে ছুটিতে এসেছিলেন অধ্যাপক যতীনবাবু। আমারই সমবয়সী। এরই মধ্যে তাঁর সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা হয়ে উঠেছিল। আজ তিনিই আমাকে টেনে নিয়ে কাছে বসালেন, খেলাটেলা এক আধটু শিখুন ত্রিলোকেশবাবু।

কি একটা কাজের অছিলায় দিল্লী একবার এ ঘরে এসে ঘুরে গেল। তারপর আর একটু বাদেই এল শম্ভু। আমার কাছে এসে বলল, পড়ার ঘরে দিদিমণি আপনাকে ডাকছেন।

সবাই একবার এ ওর দিকে অর্থবোধক ভঙ্গিতে তাকালেন। তারপর হঠাৎ যেন আপন আপন তাসগুলির ওপর গভীর মনোযোগী হয়ে পড়লেন প্রত্যেকে।

যতীনবাবু বললেন, আপনাকে এখানে মাস্টারীও করতে হয় তা তো

বলেননি।৺ তারপর তাসগুলি উঁচু ক'রে নিজের মুখ আড়াল করলেন। বোধ হয় হাসি গোপন করবার জন্যে।

যোগলক্ষ্মীর কথায় চমকে উঠলাম। তিনি অনুনয়ের ভঙ্গিতে বলছেন, যাও ত্রিলোকেশ একটু দেখিয়ে শুনিয়ে দিয়ে এসো। পরীক্ষার চাপে শ্রীমতীর এতদিনে বোধ হয় সুমতি হোলো। আমি তো হাজার বার বলেও ওকে একবার বই নিয়ে বসাতে পারিনে, তুমি জাত মাস্টার, তোমার ধমকটমকে যদি কিছু কাজ হয়। তারপর যতীনবাবুর দিকে তাকিয়ে তিনি একটু হাসলেন, মাস্টারীর কথা বলেছিলেন, ও বড় সাংঘাতিক জিনিস। একবার ও ব্যবসা নিলে আর রক্ষা নেই। আপনি ছেড়ে দিলেও তা আপনাকে ছাড়বে না।

যোগলক্ষ্মীর দিকে একবার তাকালাম। তখনো তাঁর মুখে হাসি লেগে রয়েছে। কী এই হাসির অর্থ। একি তাঁর ব্যঙ্গ, একি তাঁর অভিমান, কিংবা দুইই ?

গম্ভীর মুখে সিঁড়ি বেয়ে দিল্লীর পড়বার ঘরে এসে উপস্থিত হলাম। চায়ের সরঞ্জাম সামনে ক'রে বসে নিজের মনে সেগুলি নিয়ে দিল্লী যেন খেলা করছে। সুন্দর একখানি টেবিলঢাকনিতে মোড়া ছোট্ট গোল টেবিলটার ওপর ফুলদানীতে দু'টি চন্দ্রমল্লিকা। আমাকে দেখে দিল্লী বলল, আসতে পারলেন এতক্ষণে ?

বললুম, হুঁ, কি ব্যাপার বল দেখি ?

বাঃ, কথাটা যে আমিই জিজ্ঞেস করব ভেবে রেখেছি। ব্যাপার কি, হঠাৎ অমন তাসে মেতে উঠলেন যে ? অথচ খেলার তো কিছু জানেন না। ফাঁকি যাদের দিতে চান তারা আপনার চেয়ে ঢের চালাক। অনর্থক পণ্ডশ্রম ক'রে লাভ কি। তার চেয়ে নিশ্চিন্তে চুপ চাপ বসে চা খাওয়া অনেক ভালো।

এক কাপ চা আমাকে এগিয়ে দিয়ে আর এক কাপ দিল্লী নিজের দিকে টেনে নিল।

ওর এ ধরনের প্রগল্‌ভতা আমার অপরিচিত নয়। কিন্তু আজ যেন তা সমস্ত সীমা অতিক্রম ক'রে যাচ্ছে মনে হোলো। ওর গাঢ় রক্তবর্ণ দু'টি প্রবালের দুলে, কবরীর উদ্ধত ভঙ্গিতে পৃথিবীর সমস্ত অসংযম, সমস্ত আতিশয্য যেন পুঞ্জীভূত হয়েছিল।

এ সব অবশ্য এখন যেমন ক'রে আমি দেখতে পাচ্ছি সেদিন ঠিক তেমন ভাবে দেখিনি। আমার চোখের সামনে তখন যোগলক্ষ্মী আর তাঁর বন্ধুদের সকৌতুক চোখগুলি বারংবার ভেসে ভেসে উঠছে।

ওর সামনের সোফাটায় বসলুম। কিন্তু চা আমি স্পর্শ করলুম না, বললুম শম্ভু আমাকে বলছিল আমার কাছ থেকে পরীক্ষা সম্বন্ধীয় কি নাকি তোমার বুঝে নেওয়ার আছে।

দিল্লী মৃদু হাসল, ও ছাড়া শম্ভু আর কি বলতে পারত।

আর হঠাৎ ওর সেই হাসি, সেই ছোট্ট টুক্‌রো টুক্‌রো কয়েকটি কথায় আমার মনে হোলো পৃথিবীতে এর চেয়ে দুঃসহতর অশ্লীল কিছু যেন আর হতে পারে না। ও যখন আরও স্পষ্ট, আরও মুখর হয়ে উঠবে কি ক'রে আমি তা সহ্য করব ?

হঠাৎ উনিশ কুড়ি বছর আগেকার আরেকটি দৃশ্য আমার চোখের সামনে ভেসে উঠল। সেদিন অসহ্য আবেগে একটি যুবক যোগলক্ষ্মীর একখানি হাত নিজের মুঠির মধ্যে চেপে ধরেছিল। আজ বুঝতে পারছি কেন যোগলক্ষ্মী সেদিন একবার শিউরে উঠে পাথরের মত অমন নিঃস্পন্দ হয়ে গিয়েছিলেন, তারপর একটু পরে হাত ছাড়িয়ে নিয়ে কেমন ক'রে বলতে পেরেছিলেন, ছিঃ, কি ছেলেমানুষি হচ্ছে ত্রিলোকেশ।

আমার ভাবান্তর হয় তো দিল্লী তখনো লক্ষ্য করেনি। কিংবা লক্ষ্য করলেও

আমল দিতে চায়নি। নিজের ঐশ্বর্যে ও তখন পরিপূর্ণ। আমার দিকে একবার তাকিয়ে বলল, হঠাৎ অমন গম্ভীর হয়ে গেলেন যে! চা খান। ভালো কথা আপনাকে একটা খবর তো এতক্ষণ দিইনি।

শুষ্ক কণ্ঠে বললুম, কি খবর?

একটা দিন সবুর করতে পারলে খবরটা আপনাকে চাক্ষুষ দেখাতে পারতাম, কিন্তু সবুর করা আমার স্বভাবে নেই। তাতে মেওয়া যদি না ফলে না ফলল। সেই গল্পটা প্রেসে দিয়েছি আর আমাদের দু'জনের নামে সেটা বেরুচ্ছে। ভেবে দেখলাম ধরা যদি পড়তেই হয় দু'জনে একসঙ্গে পড়াই ভালো।

মুহূর্তকাল আমি যেন কোনো কথা বলতে পারলাম না। এ আমি করেছি কি! নিজেকে এমন করেই ছেড়ে দিয়েছি যে, দিল্লীর মত এতটুকু ঐ মেয়ে আমাকে খেলার সঙ্গী ছাড়া আর কিছু ভাবতেই পারে না? আমার বয়স, আমার সাংসারিক এবং সামাজিক প্রতিষ্ঠা কিছুরই কি গুরুত্ব নেই, ওর লঘু চাপল্যে সমস্তই কি এমন ক'রে ভাসিয়ে দেওয়া যায়?

হঠাৎ কঠিনকণ্ঠে বললাম, আমার নাম নিয়ে এমন ছিনিমিনি খেলবার স্পর্ধা তোমার কাছ থেকে আশা করিনি দিল্লী।

মুহূর্তখানেক বিস্মিত হয়ে দিল্লী আমার মুখের দিকে তাকিয়ে রইল, তারপর অদ্ভুত একটু হেসে বলল, অত ঘাবড়াচ্ছেন কেন? যাতে কেউ কিছু মনে না করতে পারে, ব্র্যাকেটে দু'জনের বয়সের কথাটা উল্লেখ ক'রে দিলেই হবে।

জবাবে কি একটা কথা বলতে গেলাম; কিন্তু সেই মুহূর্তে কোনো কঠিন কথাই বাংলা কি ইংরেজী ভাষায় খুঁজে পেলাম না। তাড়াতাড়ি বেরিয়ে এলাম ঘর থেকে। সিঁড়ির মুখেই নিচ থেকে তুমুল হাস্যধ্বনি শুনতে

পেলাম। তাসের আসরেও হয় তো নতুন কোনো কৌতুকের কথা উঠে থাকবে।

নিভন্ত চুরুটটা সজোরে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে ত্রিলোকেশবাবু একটু হাসলেন, চলুন আমরাও এবার উঠি।
বললুম, হ্যাঁ চলুন।

হাসপাতাল

দীর্ঘদীন ধরে জটিল রোগে ভুগছে মায়া। প্রতিমাসে অসুখটা আরো বাড়ে। কাজকর্ম, নড়াচড়া তাই নিয়েই করে বটে কিন্তু মুখের দিকে ওর তাকানো যায় না। অমূল্য নিজেই রগ-চটা মানুষ। কিন্তু তার চেয়েও দু'তিন ডিগ্রি উত্তপ্ত হয়ে থাকে মায়ার মেজাজ। ভারি হিসাব ক'রে কথা বলতে হয়, প্রতিমুহূর্তে পা ফেলতে হয় টিপে টিপে, না হলে শেষে কি একটা মাথা ফাটাফাটি ক'রে বসবে। অমূল্যর মা বিন্দুবাসিনীকেও তটস্থ থাকতে হয় এসব সময়, কোনো কড়া কথা মুখের আগায় এসে পড়লে, আরো পাঁচটা নরম কথায় বউকে খুশি করবার চেষ্টা করেন, জপের সংখ্যা কমিয়ে মায়ার কোলের মেয়েটিকে নিজেই সর্বদা আগলে রাখেন। তবু একেকবার এমন হয়ে পড়ে যে, বিছানা ছেড়ে আর নড়তে পারে না মায়া। সাময়িক উপশমের জন্যে ডাক্তার ডাকতেই হয়, ব্যবস্থা করতে হয় ওষুধপত্রের, যা অমূল্যর পক্ষে বেহিসাবী খরচ। এমনিতেই সুখের সীমা নেই, তারপর আবার অসুখ।

শেষ পর্যন্ত একটা সুবিধা জুটে গেল। বন্ধু কিরণময়ের ভাই হিরণ্ময় আছে সেবাসদনে। একদিন কিরণ তাকে নিয়ে গেল সঙ্গে ক'রে। অনেক ওজরআপত্তির পর হিরণ বলল, আচ্ছা, কিন্তু ফ্রী বেড ছাড়া তো চলবে না, খালি হলেই খবর দেব।

তারপর আরো দু'মাস ধরে চলল রবিবার রবিবার ট্রামে বাসে ছুটোছুটি,

একদিন কিরণের কাছে আর একদিন হিরণের ওখানে। শেষ পর্যন্ত একদিন পাওয়া গেল বেড।

মায়া বলল, কিন্তু মঞ্জুকে ছেড়ে থাকব কি ক'রে?

অমূল্য বলল, শুধু মঞ্জুর কথাই মনে পড়ল?

মায়াও হাসল, আর আবার কার কথা মনে পড়বে?

ঘণ্টা পড়বার পরও দু'তিন মিনিট মায়া অমূল্যর হাতখানা নিজের মুঠির ভিতরে ধরে রাখল; শিগগির আর এমন ছাড়াছাড়ি হয়নি আমাদের, ধর এই যদি শেষ ছাড়াছাড়ি হয়। আর যদি দেখা না হয় আমাদের মধ্যে?

তোমার যদি নিতান্তই যদি—অফিস ছুটি হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে কোনো দিন আর কোথাও দেরি করব না। কি ভেবেছ?

মঞ্জু হয় তো ভারি কাঁদাকাটা করবে রাত্রে উঠে।

কিছু ভেব না, এরই মধ্যে আমার আর মার সে এমন বাধ্য হয়ে গেছে যে দেখলে অবাক হতে তুমি। মার কাছ ছাড়া তো সে নড়তেই চায় না।

মায়া একটু চুপ ক'রে রইল, তারপর আবার বলল, কিন্তু বাড়ি ঘরের এমন শ্রীই তোমরা ক'রে রাখবে যে, সে কথা মনে করতে আমার কান্না পাচ্ছে। আমি থাকতেই আমার হাতের জিনিস এদিক ওদিক করেছ আর আমার চোখের আড়ালে তো সব একেবারে এলোমেলো তছনছ ক'রে ছাড়বে। দেখ, পুবের দিকে শিয়রের জানলার ওপর যে তাকটা আছে, তাতে কিন্তু হাত দিও না যেন।

কেন? ওখানে তো কতকগুলি খালি বার্লির কৌটো, মঞ্জুর দু'তিনটে পুতুল আরো যেন কি কি সব রয়েছে।

যাই থাক, ওখানে হাত দিয়ে তোমাদের একেবারেই দরকার নেই,

তোমরা কেউ ছুঁলে ওর একটা জিনিসও গিয়ে পাব না। সব ঝেড়ে মুছে ফেলে দেবে কিংবা এখানকার জিনিস ওখানে রাখবে, ওখানকার জিনিস সেখানে। কাজের সময় খুঁজে নিতেই আমার তিনদিন কেটে যাবে। ওর একটা জিনিসও অকেজো নয়, সব আমার দরকারে লাগবে।

দারোয়ান দু'তিনবার ঘুরে গিয়ে আবার এসে দাঁড়িয়েছে। অমূল্য আস্তে আস্তে হাত ছাড়িয়ে আলগোছে মায়ার হাতে একটু চাপ দিয়ে উঠে পড়ল, আচ্ছা আচ্ছা, সব ঠিক থাকবে। কোনো জিনিসই নড়চর হবে না ঘরের। কিছু ভেব না তুমি।

দিনে ওষুধ খেতে হয় তিনবার, তাছাড়া ইন্‌জেক্‌সন নিতে হচ্ছে একদিন পর পর। নার্স এসে দু'বার জিভের তলায় থার্মোমিটার রেখে টেম্পারেচার নিয়ে যায়। মায়া বলে, জ্বর তো আমার নেই, তবু রোজ দু'বেলা ক'রে টেম্পারেচার নিচ্ছেন যে?

নার্সটির নাম বীণা। অল্পদিনের মধ্যেই এ ওয়ার্ডের স্টাফ্ নার্স হয়েছে। খুব যত্ন নিয়ে কাজকর্ম করে। খুঁটে খুঁটে দেখলে চেহারায় অনেক খুঁৎ আছে। কিন্তু হঠাৎ দেখলে ভারি সুন্দরী মনে হয়। মায়ার বেশ লাগে, আর যেমন চালাক তেমনি চাপা মেয়েটি। কাল রাত্রে কিছুতেই ঘুম আসছিল না। বীণার ছিল নাইট ডিউটি, অনেকক্ষণ বসে ছিল মায়ার কাছে, সেই দু'তিন ঘণ্টার মধ্যে এমন আলাপ হয়ে গেছে ওর সঙ্গে যে দু'তিন বছরেও অমন বন্ধুত্ব হয় না। চাপতে গেলে কি হবে, এমনভাবে প্রশ্ন করেছে মায়া যে, অনেক কথাই মায়ার কাছে চাপা থাকেনি। আভাসে ইঙ্গিতেই বীণা সব বলেছে বটে, খানিকটা খানিকটা অস্পষ্ট আবছায়া রেখে রেখে কিন্তু মায়া সব বুঝে ফেলেছে।

পাত্লা পর্দার আড়ালে ছায়ার মত যাদের দেখা গেল তারা এক একটি রক্ত মাংসের জীব।

টেম্পারেচারটা চার্টে টুকে রাখছিল বীণা। মায়া বলল, কথার জবাব দিলেন না যে ?

বীণা একটু হাসল, দাঁড়ান, কাজটা সেরেনি। কতরকম জ্বর থাকে মানুষের, সব জ্বরই কি আর নিজে টের পাওয়া যায় ?

মায়া বলল, নার্সদের নানা রকম জ্বর থাকতে পারে কিন্তু রোগীদের জ্বর এক রকমেরই থাকে, আমার কোনো রকমই নেই।

বীণা অন্য একটা বেডে যেতে যেতে বলল, না থাকাই অবশ্য ভালো। কিন্তু হতে কতক্ষণ, সেই জন্যেই রোজ পরীক্ষা করতে হয় আমাদের।

মায়া বলল, কিন্তু সব রকম জ্বরই কি আপনাদের থার্মোমিটারে ওঠে ?

বীণা ততক্ষণ অন্য বেডে চলে গেছে।

চমৎকার মেয়ে বীণা। মায়া মনে মনে ভাবে, অমন একটি নার্স হতে পারলে মন্দ হোতো না। ভারি সুন্দর ওর পোশাক।

পাশের বেডগুলির রোগীদের সঙ্গেও মায়ার এ কয়দিনে বেশ আলাপ হয়ে গেছে। একজনের বয়স বেশ বেশি। নাম জেনে নিয়েছে নার্সের কাছ থেকে। রাধারানী। মাগো, কী বিশ্রী সেকেলে নাম! শুনলেই হাসি পায়। তা হলেও রাধারানী মানুষটি কিন্তু ভালো। ঠিক নিজের মেয়ের মত দেখে মায়াকে। দিনের মধ্যে খোঁজ খবর নেয় কতবার। ওঁর দুঃখের কথাও মায়া শুনেছে। আহা, বেচারার সন্তানাদি নেই একেবারে, তারপর স্বামীটি জীবনভর অমন অত্যাচার করেই গেল।

আজ চারটে বাজার সঙ্গে সঙ্গেই অমূল্য এসে উপস্থিত হোলো। হাতে

কাগজের ঠোঙায় কিছু ফল-মূল; আর এ মাসের নতুন 'প্রবাসী'টা। কাল আসতে পারেনি। ব্যাঙ্কের কেরানী, সেক্রেটারী হীরেনবাবুর চেষ্টায় সম্প্রতি কিছু ইনক্রিমেণ্ট পেয়েছে। কাল তিনিই এমন কাজের চাপ দিয়ে দিলেন যে শেষ করতে রাত সাতটা। অথচ অমূল্যের স্ত্রী যে হাসপাতালে, তাকে যে রোজ তার দেখতে যেতে হয়, তা হীরেনবাবু বেশ জানেন। অমূল্যকে উসখুস করতে দেখে হীরেনবাবু নিজেই বললেন, অমন করছ কেন অমূল্য, কাজকর্ম করো মন দিয়ে। বউ তো আর পালিয়ে যাচ্ছে না। আর স্ত্রীরোগ এমন কিছু মারাত্মক রোগ নয়, ও সকলের স্ত্রীরই থাকে! হাসপাতালে আমাকেই কি এক সময় কম দৌড়াদৌড়ি করতে হয়েছে? কিন্তু কিছুতেই কিছু হয় না। আঁতুড় ঘর থেকে বেরিয়ে যা ছিল, ফের তাই।

আজ অমূল্য এক মুহূর্ত সময় নষ্ট করেনি। দশটাতেই কাজে হাত দিয়েছে। চা অবশ্য কয়েক কাপ বেশি খরচ হযেছে কিন্তু কাজও চলেছে হাউইয়ের বেগে। হীরেনবাবু চশমার ফাঁক দিয়ে দেখেছেন আর মুচকি হেসেছেন। তারপর হীরেনবাবু যখন মিঃ মজুমদারের সঙ্গে কথা বলতে গেছেন পৌনে চারটের সময় চারতলায়, সেই ফাঁকে পেণ্ডিং ফাইল দুটো র‍্যাকের নিচের তাকে গুঁজে রেখে অমূল্য তাড়াতাড়ি উঠে পড়েছে। বুড়োর অসাধ্য কোনো কাজ নেই। আজও কতক্ষণ আটকে রাখে তার ঠিক কি?

সহকর্মী অবিবাহিত বিনোদ কিন্তু মুচকি হেসেছে, এক ঘণ্টা আগেই পালাচ্ছ? বেশ লোক যা হোক। নতুন ক'রে প্রেমে পড়লে নাকি বউর সঙ্গে? অমূল্য একটা সিগ্রেট গুঁজে দিয়েছে বিনোদের হাতে। বিনোদ বলেছে, আচ্ছা যাও যাও, কাল যেতে পারনি, আজ দেরি হলে বউ হয় তো হাসপাতাল ছেড়ে নিজেই ছুটে আসবে।

আস্তে আস্তে পা টিপে টিপে ঘরে ঢুকল অমূল্য। মায়া তখনো টের পায়নি। পাশের বেডে আর একটি প্রৌঢ় বয়সী ভদ্রলোক এসে রোগীর বিছানার পাশে বসেছে। লম্বাচওড়া দৈত্যের মত চেহারা। মায়া একলক্ষ্যে তার দিকে চেয়ে চেয়ে দেখছে। অমূল্য এসে তার বিছানার পাশে বসল। মায়া চমকে উঠে পাশ ফিরল, ও, তুমি।

আর কেউ আসবে ভেবেছিলে নাকি?

কথা শোন, আর আবার কে আসবে? ডাঃ চৌধুরী তো এখন আসেন না। তাঁর ডিউটি সকালে। কিন্তু কাল তুমি আসনি যে?

অমূল্য বলল, কাজের চাপ পড়ে গিয়েছিল। ইচ্ছা করলেই তো আর উঠে আসা যায় না।

মায়া স্নিগ্ধ হেসে বলল, আমি তা আগেই বুঝেছি। সেই বুড়ো হীরেন-বাবু চেপে ধরেছিল তো?

মায়া আর একবার পাশের বেডের দিকে তাকাল তারপর অমূল্যর গা টিপে ইসারায় সেই দীর্ঘাকৃতি ভদ্রলোককে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিল।

অমূল্য বলল, কি?

চেয়েই দেখ, ফিস্ ফিস্ ক'রে বলল মায়া।

দেখবার মধ্যে ভদ্রলোকের চেহারাটা কিছু স্থূল আর রঙটা একটু ফরসা, ঠোঙায় ক'রে অমূল্যর মত আঙুর নিয়ে এসেছেন, আর এক একটা ক'রে সেই মহিলাটির মুখে তুলে তুলে দিচ্ছেন। এর মধ্যে দেখাবার কি আছে, অমূল্য ভেবে পেল না। বলল, আঙুর খাবে তুমি এখন? আমিও এনেছি।

মায়া হাসল, হুঁ, আমি ছোট খুকি কিনা যে, একজনকে আঙুর খেতে দেখে আমারও আঙুর খাওয়ার লোভ যাবে। কিন্তু রাধারানীদি ছোট একটি খুকির মতই আঙুর খাচ্ছেন, খাবেনই বা না কেন? যে

ভদ্রলোককে দেখতে পাচ্ছ বেশ শান্ত, নিরীহ, ভালো মানুষটির মত এক একটি আঙুর তুলে দিচ্ছেন, ওঁর হাত থেকে এতকাল রানীদি কিল, ঘুষি, চড়চাপড়ই খেয়ে এসেছেন, আঙর নয়। কিন্তু ভদ্রলোককে দেখলে কি মনে হয় সত্যিই উনি মদ খান? মনে হয় না কি রানীদির সব বানানো কথা?

অমূল্য কি বলতে যাচ্ছিল, কিন্তু মায়ার কথা তখনো ফুরোয়নি। অমূল্যকে বাধা দিয়ে সে বলে চলল, নামটি মাতালের মত নয়। প্রশান্ত। বেশ নাম, নয়? কিন্তু এই শান্ত নাম আর চেহাবার আড়ালে ভদ্রলোক যা কীর্তি করেছেন জীবন ভরে তা যদি শোন। রাধারানীদি সেদিন সব বলছিলেন। মদ খায় এমন লোককে এত কাছ থেকে এই প্রথম দেখলুম। এত আশ্চর্য মনে হয়। শান্তশিষ্ট লোক কিন্তু কত কাণ্ডই না করেছেন জীবনে। রানীদিই বা কতটুকু তার জানেন? আচ্ছা মদ খেতে কেমন লাগে? এই আঙুরের রস থেকেই না কি মদ তৈরি হয়?

অমূল্য বলল, হুঁ, তা হয়। কিন্তু আপাতত দু'একটা আঙুরই না হয় খাও। আঙুরের রস ক'রে আর একদিন খাওয়ান যাবে। কেমন আছ? ইন্‌জেক্‌সন দিয়ে গেছেন বুঝি সকালে ডাঃ চৌধুরী?

কি ভুলো মন তোমার। ইন্‌জেক্‌সন তো দিয়ে গেছেন কাল। আবার কাল সকালে দেবেন। আজ এসেছিলেন এমনি। শিশির ওষুধটা দেখে গেলেন। বললেন, পালটাবার আর দরকার নেই। বললুম, না ওটা আজই পালটিয়ে দিন, এমন বিশ্রী স্বাদ। ডাঃ চৌধুরী হেসে বললেন, কিন্তু রঙটা কি চমৎকার দেখেছেন? দেখে তো আমার নিজেরই খেতে লোভ হচ্ছে। বললুম, খান না, শিশি সুদ্ধু আপনি খেয়ে ফেলুন, তা হলে তো বাঁচি। ডাঃ চৌধুরী হাসতে লাগলেন; বললেন, আমি সত্যি খেতে পারি, কত সময় কত জিনিস খেতে হয়

আমাদের। কিন্তু আমি খেলে কি আপনার রোগ সারবে? সারে কি না সারে সে দেখা যাবে, আপনি আগে খান তো দেখি। ডাঃ চৌধুরী হাসতে হাসতে বললেন, আচ্ছা সে আর একদিন দেখবেন, আজ আপনি খান আমি দেখি। এমন ক'রে আর কোনো ডাক্তার রোগীদের ওষুধ খাওয়ান না। সব সময় তাঁরা কেবল ঘড়ি দেখছেন। কিন্তু ওঁকে কোনোদিন তাড়াহুড়ো করতে দেখলাম না, যেন এই হাসপাতালই ওঁর বাড়িঘর, যেন খাওয়ার কথা ওঁর মনেই থাকে না। বিলাত ফেরত। কিন্তু কোনো দেমাক নেই মনে। বিয়ে থা করেননি, কোনোদিন নাকি করবেনও না। এমন চঞ্চল এমন ফুর্তিবাজ লোক আমি আর কোথাও দেখিনি। হাসি খুশি দিয়ে ভুলিয়ে রাখছেন রোগীদের সব সময়। যেন আমরা কেউ রোগী নয়, তিনিও চিকিৎসা করতে আসেননি। কেবল দেশ বিদেশের গল্প। অথচ সবাইকে ভুলিয়ে নিজের কাজ বেশ সেরে যাচ্ছেন। একদিন বলেছিলুম, বেশ তো ফাঁকি দিতে শিখেছেন, ভেবেছেন কেউ বুঝি ধরতে পারবে না? ডাঃ চৌধুরী যেতে যেতে বলেছিলেন, তা বলে দু'একজনও কি আর পারবে না? একেবারে কেউ ধরতে না পাবলে ফাঁকিটা নিতান্তই ফাঁকা ফাঁকা লাগে। 'এমন চমৎকার কথা বলেন। আচ্ছা, মাইনহেড নামে একটা স্টেশন আছে বুঝি বিলাতে?

অমূল্য বলল, থাকতে পারে। ম্যাপ খুলে কাল ভালো ক'রে দেখে আসব। ভালো কথা, তোমার সেই পুবের তাকের থেকে একটা বার্লির কৌটো নিয়ে মা তার মধ্যে স্ঁচ স্থতো রেখেছেন।

মায়া বলল, বা দরকার হ'লে নেবেন না? আমি কি ওগুলো দিয়ে গলায় মালা তৈরি ক'রে পরব? সে দিন বলেছিলুম বলে বুঝি ঠাট্টা করা হচ্ছে?

মঞ্জু রাত্রে উঠে মাঝে মাঝে এখনো কাঁদে।

মুহূর্তের জন্যে মায়ার মুখে একটু ছায়া পড়ল, তারপর বলল, ভুলিয়ে টুলিয়ে রেখো। কি আর করা যাবে? ডাঃ চৌধুরী বলেছেন, আরো তিন সপ্তাহের কম তো নয়ই। দিন দশেক কেবল গেছে। আর একদিন নিয়ে এসোনা মঞ্জুকে, সেদিনের মত। না হয় থাক, শেষে ছাড়তে চায় না, কেবল কাঁদাকাটা করে, তার চেয়ে ভুলে থাকলেই ভালো। আর কটা দিনই বা বাকি?

ভালোই আছ তা হলে? কোনো অসুবিধাটসুবিধা হয় না তো রাত্রে? নার্স থাকে তো কাছে কাছে?

কাল পর্যন্ত ছিল বীণা। চমৎকার মেয়ে, আজ রাত্রে আর একটি নতুন নার্সের ডিউটি পড়েছে।

ইতিমধ্যে একটি তরুণী নার্স ঘরে ঢুকে উত্তরের একটি বেডের দিকে চলে গেল।

মায়া বলল, এই সেই।

কে?

বা, যার কথা এত দিন ধরে তোমাকে বলছি? বীণা। আজ ওর দুপুর থেকে সন্ধ্যা-পর্যন্ত ডিউটি।

অমূল্য মেয়েটিকে একবার দেখে নিল। মায়া হাসল, মেয়ে অতটুকু দেখলে কি হবে? এখানকার স্টাফ্ নার্স। কাজকর্মে এত আগ্রহ কাজের মধ্যে ও যেন একেবারে মেতে থাকে। হাসপাতালের ভিতরে সবাই ওর প্রশংসা করে; আর শুধু কি ভিতরেই?

অমূল্য বলল, বাইরেও ওর প্রশংসা খুব চলছে বুঝি?

প্রশংসা নয়, প্রশংসা তো নিতান্ত ফাঁকা জিনিস। তিনটি ছেলে ওকে ভালোবাসে।

একটি নয়, দুটি নয়, তিনটি ?

আগাগোড়া গল্পটা শুনলে তোমারও তাই মনে হবে। নাম আমাকে ও বলেনি। একজন বেশ ভালো ছেলে, ডাক্তারী পড়ে, আর একজন একেবারে বখাটে, পড়াশুনো ছেড়ে দিয়ে সিনেমায় ঢুকেছে, বড়লোকের ছেলে, চেহারা ভালো, মদ টদও এক আধটু ধরেছে আর একটি—

ঢং ঢং ক'রে ঘণ্টা পড়ল। ওয়ার্নিংএর ঘণ্টা।

মায়া বলল, উঠলে যে? এ তো ওয়ার্নিংএর ঘণ্টা, এখনো আধ ঘণ্টা বাকি। শোনই তারপর আর একটি—

অমূল্য উঠে পড়ে বলল, আর একটির কথা থাক। সে বোধ হয় কোনো ব্যাঙ্ক ট্যাঙ্কের কেরানী।

সিঁদুর

বন্ধুদের কাছ থেকে চেয়ে আনা নতুন সাময়িকপত্রগুলি, প্লেটে ক'রে কিছু কিছু আঙুর আর বেদানা ছোট টুলটার ওপর সুজাতা সাজিয়ে রাখতে লাগল। একটা শিশিতে এক দাগ মাত্র ওষুধ আছে, আর সব শিশিগুলি খালি। সেগুলি টেবিলের ওপর গুছাতে গুছাতে সুজাতা অনেকটা যেন নিজের মনেই বলল, ওষুধ তো একেবারেই ফুরিয়ে গেছে, আজ নিয়ে আসতে হবে আসবার সময়।

বাঁ কাত হয়ে মুরারি এদিকে চেয়ে চেয়ে দেখছে। নানা টুকিটাকি কাজে ঘরের এদিক ওদিকে যাচ্ছে সুজাতা ; টেবিলটা গুছিয়ে রাখছে, জানালার তাক পরিষ্কার করছে, দুখানি হাতের এই কর্মব্যস্ততা, অঙুলগুলির বিভিন্ন ভঙ্গি, সব খুঁটে খুঁটে লক্ষ্য ক'রে যাচ্ছে মুরারি।

মুখ না ফেরালেও মুরারির এই অপলক দৃষ্টি সুজাতা বেশ অনুভব করতে পারছে। প্রথম প্রথম এই অনুভূতি তাকে অস্বস্তি দিত, এখন বেশ সয়ে গেছে, এখন কিছুমাত্র অসুবিধা আর বোধ করে না সুজাতা।

কিছুক্ষণ চুপ ক'রে থেকে মুরারি হঠাৎ জিজ্ঞাসা করল, ক'টা বাজল, দেখ তো। তোমার বুঝি আবার বেলা হয়ে পড়ল স্কুলের।

মুখ ফিরিয়ে মৃদু একটু হাসল সুজাতা, এখনো আধঘণ্টা খানেক দেরি আছে। আপনার তো আশঙ্কা হতে থাকে সেই সাতটা থেকে।

ধরে ফেলেছ ? তোমার কাছ থেকে কিছু আর লুকোবার জো নেই।

কিন্তু লুকোতে পারলেই যেন ভালো হোতো। আর ক'টা দিনই বা বাকি। তার কাছে ধরা দিয়ে লাভ কি হোলো যাকে ধরবার শক্তিও নেই, সময়ও ফুরিয়েছে।

কাজ সেরে সুজাতা এসে ফোল্ডিং চেয়ারটা টেনে নিয়ে বসল সামনে। ঘড়িটা তুলে ধরে বলল, দেখুন এখনো কতো সময় আছে, পুরো পঁচিশ মিনিট। আপনি তো এরই মধ্যে ব্যস্ত হয়ে উঠেছিলেন। একদিন লেট হয়েছিলাম বলে কি রোজই হব?

মুরারি হাসল, তা কেন হবে? ওষুধপত্রে কেন আর মিছামিছি খরচ করছ? ওষুধ নয়, সেই দামে বরং কিছু বই নিয়ে এসো আসার সময়।

সুজাতা বলল, বইয়ের অভাব কি? কি বই চাই বলুন। বলব বিমলকে।

কি মনে পড়ে গেল মুরারির, বলল, না থাক শেষ ক'টা দিন নিরক্ষর যুগেই বরং বাস করা যাক। বই আর পড়তে ভালো লাগে না।

সুজাতার মুখে একটু যেন ছায়া পড়ল।

মুরারি বুঝতে পারল আরো খানিকটা দুর্বলতা প্রকাশ হয়ে পড়ল তার। যার কাছ থেকে নানাভাবে তাকে সাহায্য নিতে হচ্ছে—অর্থে, সেবায়, তার কাছ থেকে বই নিয়ে পড়তেই আপত্তি। নিজেকে কিছুতেই কেন সংযত ক'রে রাখতে পারে না মুরারি। এই মেয়েটির মনে নিজের সম্বন্ধে হীনতার ছাপ যাওয়ার সময় না রেখে গেলেই কি চলত না? একটু চুপ ক'রে থেকে মুরারি বলল, বই নয়, বিমলকেই সঙ্গে ক'রে নিয়ে এসো। ক'দিন যাবৎ তো সে আসেই না।

বিমল তো ছিল না এখানে, খুলনায় কনফারেন্সে গিয়েছিল। এসে পৌঁছেচে কেবল।

ও, ভুলে গিয়েছিলাম। এ সময় এ ধরনের ভুল বোধ হয় এক আধটু হয়। তাকে নিয়ে এসো কিন্তু।

সুজাতা বলল, আপনি কেবল এ সময়, এ সময় যদি করেন আমি উঠে চলে যাব।

মৃত্যুর কথা মানুষের ভালো লাগে না। মুরারি নিজের মনে একটু হাসল। তাকে ভয় করলেও চলবে না, কবিত্ব করলেও চলবে না তাকে নিয়ে। সে তো ভয়েরই আর এক রূপ। কিন্তু গুলীতে কি ফাঁসীতে শুধু মুহূর্তব্যাপী বিদ্যুৎ ঝলকের মত যে মৃত্যু তা তো তার হোলো না। তার মৃত্যু দীর্ঘকাল ধরে তিলে তিলে ক্ষয় হয়ে যাওয়ায়। এ মৃত্যুতে কাব্যের রঙে আশঙ্কাকে মাঝে মাঝে না রাঙালে চলে না।

ক'টা বাজল? মুরারি আবার জিজ্ঞাসা করল।

এই আর এক উপসর্গ হয়েছে মুরারির। প্রতিটি মিনিট যেন সে গুণে গুণে দেখতে চায়। প্রতিটি মুহূর্ত সে যেন অনুভব করবে। কিন্তু সময় কি এমন হিসাব ক'রে অনুভব করা যায়, এমন ঘড়ির কাঁটা দেখে দেখে?

সুজাতা বলল, ক'টা আপনার দরকার বলুন।

আমার? ঠিক দশটা।

সুজাতা বলল, মানে রাগ ক'রে আমাকে আপনি উঠে যেতে বলছেন। দশটা বাজতে এখনো কয়েক মিনিট আছে। কিন্তু ঘড়ির কাঁটাকে ঘুরিয়ে দিয়ে আমি এখানে চুপচাপ বসে থাকব, উঠব না।

হাসলে কি চমৎকার দেখায় মেয়েদের। একবার সুজাতার দিকে তাকিয়ে চোখ ফিরিয়ে নিল মুরারি। সুজাতার ঘড়ির কাঁটা অত সহজে ঘুরবে না, মুরারি জানে! কিন্তু তার এই সুন্দর হাসি, ওই মিষ্টি কথায় এ-মুহূর্তে বেশ ভাবতে পারা যায়, ভাবতে ভালো লাগে, সত্যিই সে ঘড়ির কাঁটা ঘুরিয়ে দিয়েছে।

মুরারির দৃষ্টি চোখ এড়ায়নি সুজাতার। এ বয়সে বহুজনের বহু দৃষ্টিই তার চোখে পড়েছে। কিন্তু মুরারির দৃষ্টিতে যেন নতুন এক পৃথিবী ধরা পড়েছে। সেখানে নতুন ক'রে বাঁচবার কামনা তার উদগ্র হয়ে উঠেছে। মরতে সে চায় না।

সুজাতাকে উঠতে হোলো। বেলা হয়ে গেছে। ম্লান মুখে মুরারি বলল, সময় হয়ে গেল বুঝি ?

কেবল সময় আর সময়। আচ্ছা ঘড়িটাই রেখে যাই আপনার কাছে। হঠাৎ সুজাতা ঘড়িটা হাত থেকে খুলতে খুলতে বলল।

ঘড়ি দিয়ে কি করব আমি ? তোমারই তো দরকার হবে ঘড়ি ঘণ্টায় ঘণ্টায়।

সুজাতা হাসল, আর আপনার যে মিনিটে মিনিটে দরকার হয়।

সে জন্যে টাইমপিসটাই আছে।

সুজাতা হেসে বলল, ওটা তো আজকাল একটু একটু চলে, একটু একটু বন্ধ হয়।

মুরারি বলল, ওই একটু একটুতেই আমার চলবে।

সুজাতা নীরবে ঘড়িটা খুলে মুরারির হাতে বেঁধে দিতে দিতে বলল, তার দরকার কি এইটাই রাখুন, যা ভালোবাসেন আপনি ঘড়ি। সারাদিন চেয়ে চেয়ে কাটিয়ে দিতে পারবেন।

ঘড়িটা বিমলের। একথা মুরারির মনে পড়ল। কিন্তু হাতটা সে সরিয়ে নিল না। সুজাতা ধীরে ধীরে ঘড়িটা পরিয়ে দিল।

যাওয়ার সময় সুজাতা বলল, কুসুম রইল নিচে। ওকে সব বলে দিয়ে গেলাম, ওষুধ এক দাগ খেয়ে ফেলবেন। আর ঘুমুতে চেষ্টা করবেন দুপুরে। আকাশ পাতাল ভাববেন না।

ভাববার আর কি আছে ?

সিঁড়ি বেয়ে নিচে নেমে গেল সুজাতা। রান্না ঘরে কুসুম কি করছিল। তাকে ডেকে সুজাতা বলল, যা যা বলে গেলাম তা যেন মনে থাকে, কুসুম। দুপুরটা একেবারে ঘুমিয়ে না কাটিয়ে ওঁর একটু খোঁজখবর নিয়ো। অসুখটা আবার বেড়েছে দেখছ তো।

কুসুমের মুখে সহানুভূতির ছাপ ফুটে উঠল, বলল, হুঁ কাল যা কাসির শব্দ শুনেছি। তারপর হঠাৎ সুজাতার সিঁথির দিকে চেয়ে কুসুম বলল, তোমাকে বলে বলে আর পারলাম না দিদিমণি। কিছুতেই সিঁথিতে সিঁদুর দেওয়ার কথা তোমার মনে থাকে না। হিন্দুর ঘরের সধবা তো, পান খাও না, সিঁদুর পর না, আগে থাকতেই এসব বাড়াবাড়ি করছ কেন। কপালে যা আছে তাতো হবেই, তবু তো লোকে বলে যতক্ষণ শ্বাস, ততক্ষণ আশ।

সুজাতা বলল, আচ্ছা আচ্ছা কাল থেকে পরব।

কুসুমের দৃঢ় বিশ্বাস এরা স্বামীস্ত্রী। শুধু কুসুমই নয়, সুজাতার আত্মীয়-স্বজন পরিচিত বন্ধুবান্ধবও তাই বিশ্বাস ক'রে নিয়েছে। স্বামী ছাড়া, অন্তত স্বামীস্থানীয় ছাড়া, আর কার জন্যে মেয়েরা এমন ক'রে আত্মোৎ-সর্গ করতে পারে? এ আজকাল তার রাজনীতিক বন্ধুদেরও বিশ্বাস। শুধু যে থাইসিস রোগীর সেবা তাই নয়, মাস্টারী ক'রে, টুইশন ক'রে তার খরচ চালাচ্ছে সুজাতা। এর মূলে কি শুধু কর্তব্যবোধ? আর এত কি ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক তার সঙ্গে? প্রথম অবশ্য মুরারিই তাকে রাজনীতির মধ্যে নিয়ে এসেছিল, এক সঙ্গে কাজ করেছে, জেল খেটেছে, কিন্তু মুরারি ছিল বয়সে অনেক বড়, বুদ্ধিতে শক্তিতেও দলের সবাইকে সে ছাড়িয়ে গিয়েছিল। অন্য সকলের মত সুজাতাও দূর থেকে তাকে শ্রদ্ধা করত, ভয় করত। তারপর বারংবার জেল খাটবার পর দুর্বল, রোগজীর্ণ দেহে মুরারি যখন তার কাছে এসে পৌঁছল তখন তার মধ্যে

ভয়ের তেমন কিছু আর নেই, বিস্ময়েরও নয়। কিন্তু আর এক নতুন আলো তার মধ্যে এসে পড়েছে, সে আলো উত্তাপহীন স্নিগ্ধ মাধুর্যের।

বিমলের সঙ্গে পরিচয় হয়েছিল সুজাতার জেলের বাইরে এসে। সেও জেল থেকে সবে বেরিয়েছে। সুজাতার প্রায় সমবয়সীই হবে। তিরিশের কাছাকাছি বয়স। হঠাৎ দেখলে আরো কম বলে মনে হয়। গাঢ়বদ্ধ দুই ঠোঁটের কোণে দৃঢ় আত্মবিশ্বাস, চোখে বুদ্ধির ঔজ্জ্বল্য। দেখতে দেখতে তার ছাপ পড়তে লাগল সুজাতার মনে।

প্রথমত চেষ্টা করা হয়েছিল মুরারিকে হাসপাতালে দেওয়ার জন্যেই। কিন্তু রোগীর সংখ্যা যত বেশি হাসপাতালে সিটের সংখ্যা তত কম, তাও আবার প্রভাবপ্রতিপত্তিশালীদের জন্যে সংরক্ষিত। তবু চেষ্টা তদ্বির কম হয়নি। কিন্তু ডাক্তাররা বললেন, আপনারা যদি বলেন দু'তিন মাস পর নেওয়ার ব্যবস্থা করা যেতেও পারে। কিন্তু একে নিয়ে আর একজনের চান্স কেন মিছামিছি নষ্ট করা বিমলবাবু?

ঘনিষ্ঠ আত্মীয়স্বজন মুরারির নেই, সুজাতারও নেই। দূর সম্পর্কের যাঁরা ছিলেন তাঁরা আরো দূরে সরে গেলেন। পরোক্ষে নিন্দা আর প্রত্যক্ষে সদুপদেশ ছাড়া তাঁদের কাছ থেকে আর কিছু পাওয়া গেল না।

দায়িত্ব এসে সুজাতার ওপরই পড়ল। খানিকটা স্বেচ্ছায় খানিকটা ঘটনাক্রমে সব ভারই গ্রহণ করতে হোলো সুজাতাকে। বন্ধুদের চাঁদার ওপর সব সময় নির্ভর করা চলে না, করা ঠিকও নয়। একটা অখ্যাত নতুন স্কুলে মাস্টারী জুটল, তা ছাড়া জুটিয়ে নিতে হোলো টুইশন, তাতেও কুলোয় না, মাঝে মাঝে সাময়িকপত্রে লিখতে হয় টাকার জন্যে।

বন্ধুরা বলল, এর কি মানে হয়? তোমার অন্য কাজকর্ম কি এতে সাফার করছে না? ভেবে দেখ, একটু একটু ক'রে তুমি কি রকম আউট অফ টাচ হয়ে পড়ছ।

সুজাতা বলল, কি করব। নিজের জীবনযাত্রার জন্যেও তো টাকার দরকার। আর হাসপাতালে যখন জায়গা পাওয়া গেল না, যে ক'দিন আছেন এক জায়গায় তো রাখতেই হবে।

পরেশ বলল, এ সব রোগের কথা বলা যায় না, ক'দিনও হতে পারে, ক'বছরও যেতে পারে।

সুজাতা কোনো জবাব দিল না।

বাঁকা হেসে রমেন বলল, আসলে নীড় বাঁধার দিকে এখন সুজাতার মন গিয়েছে। মেয়েদের কাছে মেটটা উপলক্ষ, ভেটটাই বড়।

পরেশ জবাব দিল, রমেন তোমাকে এত বড় ভেট দিচ্ছে সুজাতা, তবু তোমার মন একটু টলছে না। দু'জনের হাসির সঙ্গে রমেনও অবশ্য শেষে যোগ দিয়েছিল। কিন্তু হাসি সে সহজে থামায়নি। আত্মীয়-স্বজন বন্ধুবান্ধবের কাছে নানাভাবে গল্পটিকে উপভোগ্য ক'রে বলতে বলতে নিজে সে হেসেছে, হাসিয়েছে আরো অনেককে।

হাসুক, তাতে সুজাতার কিছু এসে যায়নি। কিন্তু ইদানীং বিমলের ধরনধারণও যেন বদলে যাচ্ছে। সেও যেন উদাসীন হয়ে উঠছে। অথচ এ ব্যবস্থা বিমল আর সুজাতা দু'জনে মিলেই করেছিল। এখনো বিমল সাধ্যমত সাহায্য করে। কিন্তু একটু একটু ক'রে কিসের একটা ব্যবধান গড়ে উঠেছে। আসা যাওয়া, খোঁজখবর নেওয়া বিমল কমিয়ে দিয়েছে। সব পুরুষই কি এক রকম? বেশ তো, সুজাতার এতেও কিছু এসে যাবে না। সে মেয়ে সুজাতা নয়। বিমলের সাহায্য না হলেও তার চলবে। একটু একটু ক'রে সেও সরে আসছে।

স্কুলের ছুটির পর বিমলকে যেখানে যেখানে পাওয়া সম্ভব, সব জায়গাতেই খোঁজ নিল সুজাতা; ফোন করল কয়েক জায়গায়, তার অফিসে, দু'একটা

পত্রিকার অফিসে। সব জায়গা থেকেই খবর এলো, ছিলেন কিন্তু এই মাত্র বেরিয়ে গেলেন।

সব জায়গাতেই বিমল যেতে পারল, কেবল সুজাতাদের খোঁজ নেওয়াই সে দরকার বোধ করল না। বেশ তো, সুজাতার একারই বা এমন কি গরজ পড়েছে। নিজের বাসায় ফিরে গেল সুজাতা।

কিন্তু সিঁড়ি থেকেই শোনা যাচ্ছে বিমলের গলা। মনে মনে সুজাতা খুশি হয়ে উঠল।

খুলনায় কৃষক সম্মেলনে যোগ দিতে গিয়েছিল বিমল, তারই গল্প।

মুরারি বলল, কেমন হোলো বক্তৃতা? তোমার ভাষা ওরা বুঝতে পারল তো? তুমি তো কথ্য ভাষায় লেখ, আর লেখ্য ভাষায় বক্তৃতা কর।

বিমল বলল, না, সরাসরি খুলনার ভাষাতেই এবার বলেছি।

মুরারি বলল, তাও ভালো নয়, ঠাট্টা করছ বলে ওরা ভাবতে পারে।

সিরিয়াস জিনিসকে ওরা ঠাট্টা ভাবে, এত বোকা ওদের ভাববেন না। ভাষাটাই বড় কথা নয়, বেশভূষার মত ওটা তো ওপরের জিনিস। বক্তব্য কিছু সত্যিই যদি থাকে তা বোঝানও যায়, বোঝাও যায়।

মুরারি বলল, বেশভূষার কথা যখন তুললে, তখন বলি, ওটাও নিতান্ত ওপরের নয়, ওদিকেও লক্ষ্য রাখা দরকার। শুধু সভা সমিতির জন্যেই নয়, সাধারণ লোকে শুধু সভা সমিতিতেই যোগ দেয় না, হাটে বাজারে সব জায়গাতেই কর্মীদের জীবনযাত্রা তারা লক্ষ্য করে।

বিমল বলল, একথা আপনি আরও একাধিক বার বলেছেন, কিন্তু গৈরিকটাই যে সবচেয়ে বড় তা আমার মনে হয় না, ওটা লোকের মন ভোলাবার সহজ পথ।

মুরারি হাসল, অত সহজ হয় তো নয়, গান্ধীজীর কথা একবার ভেবে দেখ,

তুমি যাকে গৈরিক বলছ, তা তাঁর কত কাজে লেগেছে। অবশ্য তাঁর পোশাকের রঙ মনের রঙের চেয়ে আলাদা নয়। এই অভেদ কি খুব সহজ ?

সুজাতা বলল, বস চা ক'রে নিয়ে আসছি, নইলে তর্ক জমে উঠবে না।

বিমল না ভেবে পারল না যে, তর্ক জমাবার জন্যে আজকাল সুজাতা চা করতে যায়, তর্কে যোগ দিতে সহজে আসে না।

চা তো করবে, কিন্তু ক'টা বাজল ? আমাকে আবার সুনীলের ওখানে যেতে হবে।

অভ্যাসবশে নিজের হাতের দিকে একবার তাকিয়ে সুজাতা হাসল, তারপর মুরারিকে জিজ্ঞাসা করল, ক'টা বাজল দেখুন তো।

মুরারি ঘড়িবাঁধা হাতটা বিমলের দিকে এগিয়ে দিয়ে বলল, কীর্তি দেখ সুজাতার। আমার হাতে ঘড়ি বেঁধে দিয়ে গেছে। এই লেডিজ ঘড়ি কি আমাকে মানায়, এই শিকল বাঁধা কব্জীতে ?

বিমল হাসতে চেষ্টা করল, কেন মানাবে না, ওটাও তো আর একরকমের শিকল।

তিনজনেই কিছুক্ষণ স্তব্ধ হয়ে রইল। তারপর বিমল বলল, কিন্তু লেডিজ ঘড়ি কেন বলছেন। ওটা আমি নিজেই ব্যবহার করতুম। বেশ মানিয়েছে কিন্তু আপনার হাতে।

মুরারি হাসল, মানিয়েছে নাকি ? কিন্তু এত ছোট ঘড়ি তোমার পছন্দ হোলো কেন ? আগে থাকতেই বুঝি হিসাব ক'রে কিনেছিলে ?

বিমল বলল, হিসাব কি আর সব সময় মেলে। কেমন আছেন বলুন ? ওষুধটষুধ খাচ্ছেন তো নিয়মিত ?

ঘড়িটা হাত থেকে খুলতে খুলতে মুরারি মৃদু হেসে বলল, না খেলে তোমরা ছাড় কই ? বিমলকে চা-টা এনে দাও সুজাতা।

না না, সুজাতা ওসব হাঙ্গামায় দরকার নেই। কাজ আছে একটু, দেরি করতে পারব না।

কিন্তু তোমার গল্প তো শোনা হোলো না, মুরারি বলল।

আর একদিন এসে শোনাব, আজ সত্যি তাড়া আছে।

মুরারি বলল, তোমার সঙ্গে আমারও অনেক কথা ছিল। কাল একবার এসো না।

বিমল একটু দাঁড়াল, কাল কি সময় ক'রে উঠতে পারব? আচ্ছা দেখব।

সুজাতা এল পিছনে পিছনে, সত্যিই কি তোমার এত কাজ ছিল? চাটুকু খেয়ে গেলে চলত না? দিনের পর দিন কি হয়ে উঠছ তোমরা, কিচ্ছু আমি বুঝতে পারছি না।

বিমল বলল, আমিও বুঝতে পারছি না, আমার আজকাল অসত্য কাজও থাকে এ ধারণা তোমাদের কি ক'রে হতে পারল?

ধারণা করবার সুযোগ তুমি নিজেই দিয়েছ।

তা হবে। কিন্তু তোমার সঙ্গে তর্ক করবার সময়ও আজ আমার নেই।

সুজতার আজ কি হয়েছে, তীক্ষ্ণ হেসে বলল, সময় হয় তো আছে, ইচ্ছা নেই তাই বলো।

বিমল তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে সুজাতার দিকে তাকাল, ঠিক ধরেছ, এতক্ষণ ধরে এই কথাটাই বলি বলি করছিলাম।

সুজাতা বলল, কিছুক্ষণ ধরে আমিও একটা কথা বলি বলি করছি।

বলো।

ঘড়িটা তুমি নিয়ে যাও।

খোলা ঘড়িটা সুজাতা বাড়িয়ে ধরল।

বিমল এক মুহূর্ত চুপ ক'রে থেকে বলল, ও নিয়ে আর কি করব, ও থাক।

বিমল নিঃশব্দে বেরিয়ে চলে গেল।

কুসুম বলল, এসো দিদিমণি, তোমার চুল বেঁধে দি।
সুজাতা ম্লান হাসল, আমার চুল বাঁধা ছাড়া আর কোনো কাজ তুমি পেলে না কুসুম।
কুসুম বলল, আর আবার কি কাজ। তুমি যদি সব সময় অমন মুখ ভার ক'রে থাক, কোনো কাজই আমার আর করতে ইচ্ছা করে না।
সুজাতার ওপর একটু অতি বাৎসল্যের ভাব আছে কুসুমের। ঠিক তার মত একটি মেয়ে নাকি কুসুমের ছিল। অবিকল সুজাতার মত দেখতে। ছেলে হওয়ার সময় সে মারা যায়। কিন্তু জামাইর কি কাণ্ড দেখ, পুরো একটা মাসও তার সবুর সইল না। আর একটিকে বিয়ে ক'রে নিয়ে এল। এ কাহিনী অনেকদিন বলেছে কুসুম সুজাতাকে। মাঝে মাঝে কুসুমের এই বাৎসল্যে সুজাতার হাসি পায়। কিন্তু ভিতরে ভিতরে আজ এমন দুর্বল বোধ করছে সুজাতা, কারো কাছে নিজেকে ছেড়ে দিতে পারলে যেন বাঁচে।
চুল বেঁধে দিয়ে সিঁদুর লাগানো নতুন একটা মাটির মুছি তাকের ওপর থেকে কুসুম নামিয়ে আনল।
সুজাতা বলল, ওকি ?
কুসুম বলল, মার বাড়ির সিঁদুর। কালীঘাট গিয়েছিল নিচের ভাড়াটেরা। ডালার পয়সা দিয়েছি তাদের কাছে। আর সিঁদুরও আনিয়েছি। মার নাম মনে মনে স্মরণ ক'রে পর দেখি দিদিমণি। যতক্ষণ শ্বাস ততক্ষণ আশ। এর চেয়ে কত খারাপ রোগী ভাল হয়ে যায়। মার কৃপায় কি না হয়।
সুজাতা হাসল, কাণ্ড দেখ, সিঁদুর আমি পরি নাকি কোনোদিন ?
কুসুম ধমক দিয়ে উঠল, এই সব ম্লেচ্ছ আচারের জন্যেই তো তোমার

ওপর আমার রাগ হয় দিদিমণি। সধবা মেয়ে সিঁদুর পরবে না তো পরবে কি ?
সুজাতা নিজেকে ছেড়ে দিয়ে বলল, আচ্ছা কর তোমার যা ইচ্ছা।

এতক্ষণ ছিলে কোথায় ? বাঃ, ওকি করেছ ! সুজাতার সিঁথির দিকে তাকিয়ে বিস্মিতভাবে জিজ্ঞাসা করল মুরারি, হঠাৎ এ অদ্ভুত সখ হোলো যে তোমার, ছি ছি। সিঁদুর পেলে কোথায় ?
প্রথম সুজাতা একটু আরক্ত হয়ে উঠল, কিন্তু পরমুহূর্তেই বেশ সপ্রতিভ কণ্ঠে জবাব দিল ছি ছি করবেন না, কালী বাড়ির সিঁদুর। তারপর আর একবার আয়নার দিকে তাকিয়ে চোখ ফিরিয়ে নিয়ে সুজাতা বলল, কেন খুব খারাপ দেখাচ্ছে নাকি ? মুরারি দেখল এবারের হাসির মধ্যে লজ্জার আভাস সুজাতার সপ্রতিভতাকে ছাপিয়ে উঠেছে।
শোন।
চেয়ারটা আরো টেনে সুজাতা কাছে এসে বলল, বলুন।
শুধু সিঁথিতে নয় ওর মনেও কি আজ সিঁদুরের রঙ লেগেছে, কিন্তু সত্যি সত্যি এ রঙ বুলালো কে।
সুজাতা বলল, কি ভাবছেন ? কেমন দেখাচ্ছে বললেন না তো।
মুরারি ধীরে ধীরে সুজাতার হাতখানা নিজের মুঠির মধ্যে তুলে নিল, এ সব কি ছেলেমানুষি করছ সুজাতা ?
হাত সুজাতা ছাড়িয়ে নিল না, মৃদু হেসে বলল, তাতে কি হয়েছে ?
মুরারি আর কোনো কথা বলল না। কিন্তু তার হাতের মধ্যে সুজাতার হাতটা ধরাই রইল।
রাত বাড়তে লাগল। খোঁজ নিতে এসে ভেজানো দোরটা একটু ঠেলে কুসুম দাঁড়িয়ে পড়ল। কিন্তু সেই মুহূর্তেই ফিরে যাওয়ার সময় কি ক'রে

শব্দ হয়ে গেল একটু। সুজাতা তাড়াতাড়ি উঠে এল। কুসুম ততক্ষণে সরে গেছে।

শেষ রাত্রের দিকে সুজাতার ডাকে ঘুম ভেঙে গেল কুসুমের। কি হয়েছে দিদিমণি, কি? ব্যাকুলকণ্ঠে কুসুম জিজ্ঞাসা করল।
সুজাতা অবিচলিতভাবে বলল, উনি খুব বেশি অস্থির হয়ে পড়েছেন, তুমি একবার বিমলবাবুকে খবর দাও তো শিগ্‌গির। চেনো তো তার বাসা?
কুসুম চেনে। অনেকদিন ও বাসায় সে গিয়েছে। কাছেই অখিল মিস্ত্রী লেনে সে থাকে।
বিমল যখন এসে পৌঁছল তখন আর কিছু করবার নেই। মুরারি যেন ঘুমুচ্ছে, মুখে শান্ত পরিতৃপ্তির ছাপ, সুজাতা পাশে চুপ ক'রে বসে রয়েছে।
বিমলও কিছুক্ষণ চুপ ক'রে থেকে বলল, এ তো অপ্রত্যাশিত কিছু নয় সুজাতা। এ তো আমরা জানতামই।
দু'জনের চোখেই অশ্রু দেখা দিল।
নিচে কুসুমের কান্নার শব্দ শোনা যাচ্ছে।

ঘরের মধ্যে ভোরের আলো এসে পড়েছে। সেই আলোয় হঠাৎ সুজাতার সিঁথির দিকে নজর পড়ায় চমকে উঠল বিমল। আর তার চোখের দিকে তাকিয়ে সুজাতার বুঝতে বাকি রইল না অমন ক'রে কি সে দেখছে। হঠাৎ সমস্ত মুখ আরক্ত হয়ে উঠল সুজাতার। তারপর চোখের কোণ জলে ভরে উঠল।
বিমলও এক মুহূর্ত স্তব্ধ হয়ে রইল। একে একে সমস্ত কথা তার মনে

পড়তে লাগল। সেই নির্ভীক দুঃসাহসী মেয়ে সুজাতা। গুলি না চালিয়ে পুলিশ তাকে ধরতে পারেনি। গুলির চিহ্ন এখনো তার বাঁ হাতের কব্জীতে সাক্ষ্য দিচ্ছে। তারপর জেলের মধ্যে থাকতেই কি ক'রে ধীরে ধীরে তাদের মত বদলাতে লাগল। চিন্তার, কর্মের ধারা গেল বদলে, কেবল মনে প্রাণে বদলাতে পারলেন না মুরারিদা। শুধু বদলাতেই যে পারলেন না তা নয়, আর কিছু করবার সামর্থ্যও তাঁর রইল না। দেহে মনে এমনই তিনি রুগ্ন দুর্বল হয়ে পড়েছিলেন। তব তিনি লোককে আকৃষ্ট করতেন। সমুদ্রের অগভীর অংশে ভাঙাচোরা ডুবো জাহাজের চার পাশে রঙীন স্মৃতি আর মোহের তরঙ্গ ভেঙে ভেঙে পড়ত। সেবা করতে এসে সেই রহস্যের রঙ সুজাতার চোখেও যে লেগেছিল তা বিমল জানে।

কিন্তু এই কি সব? সূর্যাস্তের রঙীন স্মৃতিই কি সুজাতার মত মেয়ের জীবনে একমাত্র হয়ে থাকবে?

ওর দিকে আর একবার তাকাল বিমল। স্থির শান্ত মুখে আঙুল দিয়ে সিঁথির সিঁদুর সে বগড়ে বগড়ে তুলছে। আরো কাছে সরে এলো বিমল। তার সেই সিঁদুরমাখা হাতটা নিজের হাতের মধ্যে নিয়ে মুঠি ক'রে ধরল, বলল, থাক না।

সুজাতা নীরবে শান্ত দৃষ্টিতে তার দিকে তাকালো।

হলদে বাড়ি

চাঁদের আলো সাদা মোমের মত গলে পড়ছে শহরের ওপর। সমস্ত রাস্তাটা মখমলে ঢাকা।

আর গলন্ত মোমের মতই নরম অঞ্জনার হাত। আঙ্গুলগুলি এমনভাবে জড়িয়ে আছে চিন্ময়ের আঙ্গুলের সঙ্গে যে, চিন্ময়ের মনে হচ্ছে হাত ছাড়িয়ে নিলেও গলানো মোম তার হাতে জড়িয়ে থাকবে। হাত অবশ্য ছাড়িয়ে নিল না চিন্ময়, অঞ্জনার হাত সুদ্ধু তুলে নিয়ে নিজের ঠোঁটে ছোঁয়াল।

কয়েকজন লোক অঞ্জনার একেবারে ডান কাঁধ ঘেঁসে চলে গেল। কোনো রকমে কাঁধটা সংকুচিত ক'রে স্পর্শ বাঁচাল অঞ্জনা।

দেখেছ, রাস্তায় কি ভিড়!

চিন্ময় বলল, অন্তত চারগুণ লোক বেড়েছে ক'লকাতায়।

আরো বেশি, আরো বেশি, কিন্তু যাই বল, এবার সত্যি সত্যি কসমোপলিটান শহর হয়ে উঠল ক'লকাতা। আমেরিকান, অষ্ট্রেলিয়ান সব এসে তাঁবু পেতেছে, না আছে এমন দেশ নেই। বেশ লাগে আমার, শুধু যদি ওদের চেহারাটা অত কুৎসিত না হোতো।

চিন্ময় হাসল, ভারি একটা আফ্‌সোসের কথা বটে।

অঞ্জনা বলল, দেখ যুদ্ধ জিনিসটা আমার কাছে যে খুব অপছন্দের তা নয়। কিন্তু এখনকার মারণাস্ত্রগুলি বড় অসুন্দর। তরোয়ালের মত সূক্ষ্ম

ধারালো ঝক্‌ঝকে নয়। বড় স্থূল, জটিল সব যন্ত্র। অনেকখানি জায়গা জুড়ে সব পড়ে থাকে। যুদ্ধক্ষেত্র তাই সমস্ত পৃথিবী না জুড়লে তার চলল না।

চিন্ময় বলল, হ্যাঁ, প্রাসাদের জানালা খুলে বসে বসে দেখবে, তারপর বিজয়ীর কণ্ঠদেশ লক্ষ্য ক'রে বরমাল্য দেবে ছুঁড়ে তার উপায় নেই। এ যুদ্ধে বরং সভয়ে জানলা দরজা বন্ধ ক'রে রাখতে হয়, কখন বোমারগুঁড়ো এসে চোখে পড়বে। বড় প্রোসেইক।

অঞ্জনাও হাসল, তা ছাড়া কি, ঝক্‌ঝকে ইস্পাতের তলোয়ার, আর প্রবালের মত গাঢ় টকটকে লাল রক্ত, ভেবে দেখ তো কি সুন্দর, কোনো বাহুল্য নেই, সূক্ষ্ম পরিচ্ছন্নতা। সে যুদ্ধক্ষেত্রে দাঁড়িয়ে সত্যি বলা যায়, মরণ রে, তুঁহুঁ মম শ্যাম সমান, এদিক থেকে সেকালই আমার পছন্দ।

চিন্ময় হাসল, তোমার পছন্দের তারিফ করছি। তবে ওটা কিন্তু সেকালও নয় এ কালও নয়, কেবল যাত্রার কাল।

অঞ্জনা মুখ ভার করল, বেশ বেশ, যাত্রাই হোলো, ভারি তো ঐতিহাসিক। কেবল তথ্য খুঁটে খুঁটে গেলে। তার চেয়ে বেশি করতে পারলে না।

চিন্ময় বলল, মারাত্মক আঘাত হেনেছ এবার। সন্ধি প্রার্থনা করছি।

অঞ্জনা হাসল, বিনা সর্তে তো?

চিন্ময় বলল, না, একেবারে বিনা সর্তে নয়, দু'একটা সর্ত আছে।

পথ দিয়ে যেন ওরা হেঁটে যাচ্ছে না, হাওয়ায় ভেসে চলেছে। রাস্তায় ভীড় এখনো আছে। ট্রাম বাস আর ট্যাক্সি চলছে সশব্দে। পেভ-মেণ্টের ওপর স্থানে স্থানে কতকগুলি লোক হাত পা জড়ো ক'রে কুণ্ডলী পাকিয়ে শুয়ে পড়েছে। অভ্যাসবশে তাদের পাশ কাটিয়ে রাস্তায় নেমে পড়ছে চিন্ময়, আর তাকে ছায়ার মত অনুসরণ করছে অঞ্জনা। দু' পাশের বাড়িগুলি স্তব্ধ দাঁড়িয়ে। জ্যোৎস্নায় ভিজে উঠেছে। কিন্তু বর্ণ

গন্ধ ধ্বনি ভরা এই পরিচিত পৃথিবী ওদের কাছ থেকে যেন অবলুপ্ত হয়ে গেছে। সব কিছুতে মিলিয়ে আছে শুধু একটা অশরীরী সৌরভ, বহুদূর থেকে ভেসে আসা অস্পষ্ট সেতারের মধুর একটা টান। কিন্তু আরো খানিকটা এসে একটা গলির মোড়ে এই জ্যোৎস্নার সমুদ্রের মধ্যে কদাকৃতি এক কুমীরের পিঠ ভেসে উঠল অঞ্জনার চোখের সামনে।

রাস্তা থেকে কয়েক হাত দূরে গলির মধ্যে ডানদিকে বড় একটা ডাস্টবিন। তারই ভিতর আকণ্ঠ ঝুঁকে পড়ে একটা লোক দু'হাতে কি ঘাঁটছে, তার পিঠটা কেবল দেখা যাচ্ছে। হঠাৎ পায়ের শব্দ পেয়ে লোকটা মুখ তুলে তাকাল। হাতে তার কিচ্ছু ওঠেনি। কেবল তরল খানিকটা জিনিস দু'হাতে জড়িয়ে গেছে। তাতে জিভ লাগিয়ে একটু চেটে লোকটিও মুখ বিকৃত করল। তারপর অঞ্জনাকে দেখে ছুটে এসে হাঁটু গেড়ে দু' হাতে তার জানু পর্যন্ত জড়িয়ে ধরল। মুহূর্তের মধ্যে কাণ্ডটি ঘটে গেল। চিন্ময় কি অঞ্জনা বাধা দেওয়ার অবকাশ পর্যন্ত পেল না। দু'জনেই মুহূর্তখানেক স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে রইল। তারপর অঞ্জনা নিজেকে ছাড়িয়ে নেওয়ার চেষ্টা করতে করতে বলল, ছি ছি ছাড়ো ছাড়ো।

প্রত্যুত্তরে লোকটি অঞ্জনার জানু দুটি আরো আঁকড়ে ধরে প্রায় নিজের বুকের সঙ্গে মিশিয়ে ফেলল, তারপর ঊর্ধ্বে অঞ্জনাব মুখের দিকে তাকিয়ে ফিস ফিস ক'রে কি বলল বোঝা গেল না।

অঞ্জনা আবার অসহায়ের মত বলল, ছাড়ো ছাড়ো।

পাশ থেকে চিন্ময়ও ধমক দিয়ে উঠল, এই ছাড়্, ছাড়্ শিগ্‌গির।

লোকটি যেন ভ্রুক্ষেপই করল না, বার দুই জুতার ওপর মুখ রাখল অঞ্জনার, তারপর আবার মুখের দিকে তাকিয়ে অস্ফুট শব্দ ক'রে উঠল। তার মুখের বিকৃত ভঙ্গিতে কেবল বোঝা গেল সে কাঁদতে চাচ্ছে।

অঞ্জনা তিরস্কারের কণ্ঠে চিন্ময়কে বলল, তুমি দাড়িয়ে দাঁড়িয়ে কেবল মজাই দেখবে ?
এবার চিন্ময় বাহু ধরে লোকটিকে ছাড়িয়ে নিল। ধমক দিয়ে বলল, দূর থেকে চাইতে পারিসনে ? পা ধরতে গেলি কোন সাহসে ?
অঞ্জনা বিরক্তকণ্ঠে বলল, থাক্ থাক্ বীরত্ব খুব দেখা গেছে। এবার কিছু দিয়ে ওকে বিদায় ক'রে দাও।
চিন্ময়ও নিরুত্তরে গম্ভীর মুখে ব্যাগ খুলে একটা সিকি ছুঁড়ে দিল লোকটার দিকে।
আরো খানিকটা পথ হন্ হন্ ক'রে এগিয়ে গিয়ে অঞ্জনা ক্লান্ত হয়ে এক জায়গায় থামল। পরমুহূর্তে চিন্ময় গিয়ে আলগোছে অঞ্জনার কাঁধে হাত রাখল।
অঞ্জনা শিউরে উঠে কাঁধটাকে সংকুচিত করল, ছি ছুঁয়ো না, আমার সমস্ত গা ঘিন্ ঘিন্ করছে। বাড়ি গিয়ে স্নান না ক'রে নিলে আর ভালো লাগবে না। আর তুমিই বা কি রকম, ঐ হাত দিয়েই না লোকটাকে সরিয়ে দিয়েছিলে—আর সেই হাতই আমার কাঁধে রাখছ ?
এ সময় কথা কাটাকাটি করলে ফল আরো খারাপ হয়। চিন্ময় গম্ভীর মুখে হাতটা সরিয়ে নিল।
অঞ্জনা এবার কোমলকণ্ঠে বলল, আর হাঁটতে ইচ্ছা করছে না। এখনো বেশ খানিকটা পথ। একটা ট্যাক্সি ডাকবে ?
চিন্ময় বলল, এখনই ডাকছি। অনেক আগেই ডাকা উচিত ছিল।
ট্যাক্সিতে উঠে অঞ্জনা বেশ একটু ফাঁক রেখে সরে বসল। আবার বলল, ভারি গা ঘিন্ ঘিন্ করছে। বাড়ি গিয়ে ভালো ক'রে চান ক'রে ফেলতে হবে।
শুচিতার বাড়াবাড়িতে অদ্ভুত শুচিবায়ুতা দাঁড়িয়ে গেছে অঞ্জনার।

ঠিক ওর ঠাকুরমার মত। ওর মাও নাকি এমনি ছিলেন শোনা যায়।
যেন একটা বাংলা দৈনিক থেকে উদ্ধৃত করছে এমনভাবে চিন্ময় বলল, ওদের সব এখন হাসপাতালে পাঠান হচ্ছে!
অঞ্জনা বলল, তাই তো দেখছি কাগজে।

তিন চার মিনিটের মধ্যে বাড়ির সামনে এসে ট্যাক্সি থামল। জ্যোৎস্নার সমুদ্রে সাদা একখানা জাহাজ নোঙর ফেলে রয়েছে। আসলে রঙ এই জাহাজী প্যাটার্নের বাড়িখানার সাদা নয়, হাল্কা হলদে। রাত্রে এমন দেখাচ্ছে! ধবধবে সাদা রঙ পছন্দ রমলার, কিন্তু অঞ্জনা ভক্ত হলুদ রঙের, সোনালি হলুদ।
ক্ষিতীশবাবু ছোট মেয়ের পছন্দমত রঙই দিয়েছেন বাড়িখানায়। আর রমলার পছন্দ অনুযায়ী রঙ রাত্রে হয়ে যায়।
হলদে রঙ পছন্দ অঞ্জনার। জানালা দরজায় হলদে রঙের পর্দা, ফুলদানির ফুল আর কাঁচের আলমারির সারিগুলি প্রায়ই সব হলদে।
ট্যাক্সির ভাড়া মিটিয়ে গম্ভীর মুখে দু'জনে গিয়ে সিঁড়ি বেয়ে উঠল।
ডান দিকের আর একটা ঘরে ক্ষিতীশবাবু ঝুঁকে পড়ে যুদ্ধ সংক্রান্ত একটা বই লিখছেন। পেন্সনের পর যুদ্ধ সম্বন্ধে ভারি কৌতূহলী হয়ে উঠেছেন ক্ষিতীশবাবু, ঘরের দেওয়ালগুলিতে নানা দেশের বড় বড় মানচিত্র, আলমারিগুলিতে মোটা মোটা বই। সাময়িকপত্রে বিভিন্ন ছোট ছোট আর্টিকেল লিখে এবার একটা বড় বইয়ে তিনি হাত দিয়েছেন— তাই নিয়েই ব্যস্ত। কাল তাঁর তেষট্টিতম জন্মতিথি গেছে। সেই উপলক্ষে মেয়ে, জামাই আর ভাবিজামাই চিন্ময় এসেছেন। আজও তাঁদের যেতে দেননি। রবিবার অফিস আদালত সবই তো

বন্ধ, কি এমন কাজকর্ম থাকতে পারে, যা থাকে কাল করলেই চলবে।

তেতলার বড় রুমটায় ইজিচেয়ারে গা এলিয়ে দিয়ে চুরুট টানছেন অর্জুন-বাবু। রমলা শঙ্কিত মুখে বারবার দোরের কাছে আসছে আর ফিরে গিয়ে বসছে।

দোরের পাশে এসে দু'জনে দাঁড়াতেই অর্জুনবাবু বললেন, এই যে এসেছ, তোমার দিদি তো অস্থির হয়ে উঠেছেন এরই মধ্যে।

অঞ্জনা বলল, অস্থির হবার কি আছে, আসছি।

তারপর পুবদক্ষিণ কোণে তার নিজের ঘরটায় গিয়ে ঢুকল।

অর্জুনবাবু বললেন, কি ব্যাপার, হঠাৎ এমন ছদ্ম গাম্ভীর্য কেন? সিঁড়ি দিয়ে উঠতে উঠতে দু'জনে মিলে পরামর্শ ক'রে এসেছ বুঝি?

রমলা উদ্বিগ্নকণ্ঠে জিজ্ঞাসা করলেন, অঞ্জু ওভাবে মুখ গম্ভীর ক'রে চলে গেল যে? রাস্তায় কোনো কিছু ঘটেনি তো?

তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে চিন্ময়ের দিকে তাকালেন রমলা।

চিন্ময় ভারি বিরক্তি বোধ করল। এই ডিটেকটিভগিরির কি মানে হয়? তারপর অর্জুনবাবুর দিকে চেয়ে চিন্ময় জবাব দিল, কি আবার ঘটবে। একটি লোক হঠাৎ অঞ্জনাকে পথের মধ্যে জড়িয়ে ধরেছিল।

আতঙ্কে অস্ফুট শব্দ ক'রে উঠলেন রমলা। কিন্তু অর্জুনবাবু হেসে উঠলেন হো হো ক'রে, বললেন ন্যারেশনটা থার্ড পার্সনেই সুবিধা বটে। লোকটিকে দোষ দেওয়া যায় না; এমন জ্যোৎস্নাধবল রাত, জনবিরল পথ। ওই তো সম্পূর্ণ কাঙ্ক্ষিত পরিণতি! ওতে আকস্মিকতার কি আছে?

চিন্ময় বিরক্ত হয়ে বলল, পা জড়িয়ে ধরেছিল একটা ভিখারি।

এবারো অর্জুনবাবু হাসলেন, একেবারে পা? তা কি করবে ভাই, মাঝে মাঝে ভিখারিও সাজতে হয় বইকি।

চিন্ময় এবার অসহায়ভাবে রমলার দিকে তাকাল। রমলা ধমক দিয়ে উঠলেন অর্জুনবাবুকে, কি যা তা আরম্ভ করেছ। ভালো লাগে না, সব সময়েই রসিকতা।

তারপর আদ্যোপান্ত সব শুনে রমলা আরো শঙ্কিত হয়ে উঠলেন। দু' তিন বছর বয়সেই মা মারা যায় অঞ্জনার, সন্তান স্নেহে রমলাই এই ছোট বোনটিকে মানুষ ক'রে তুলেছেন।

একটু চুপ ক'রে থেকে রমলা বললেন, যে মেয়ে, এখন একটা কাণ্ড-কারখানা না ঘটালেই বাঁচি।

অর্জুনবাবু বললেন, কাণ্ড আবার কি ঘটাবে। তুমিও যেমন, গেল কোথায়?

রমলা বললেন, কোথায় আবার বাথ রুমে। সারা রাতের মধ্যে চান শেষ হয় কিনা দেখ। চিন্ময় জিজ্ঞাসা করল, এমন শুচিবায়ু হয়ে উঠল কি ক'রে।

রমলা বললেন, ছেলেবেলা থেকেই সৌখীন। পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা খুব ভালোবাসে! বাবা বলতেন, ও সৌখীন হবে না তো হবে কে, ও আমার সৌন্দর্যের প্রতিমা। তোরা কেউ কোনো বাধা দিস না, যা খুশি করুক, ওকে খুশি দেখতে ভালো লাগে না তোদের? বাড়ির কোথাও এক কণা ধুলো জমলে, কি এক টুকরো কাগজ পড়ে থাকলে ও সহ্য করতে পারে না। সেই মুহূর্তে তা পরিষ্কার করিয়ে তবে ছাড়বে। ঝি চাকরদের একটুও অপরিচ্ছন্ন থাকবার জো নেই, ও নিজে তাদের পোশাক পরিচ্ছদ পছন্দ ক'রে দিয়েছে, দু'তিন রকমের। তা আবার সপ্তাহে সপ্তাহে বদলানো চাই—ওর জানলাগুলির পর্দার রঙের মত।

এমন কি চাকরদের কারো মুখে একদিনের দাড়ি জমাবে তার জো নেই, ডেইলি তাদের শেভ করতে হবে। ঝিদের সে বালাই নেই। কিন্তু তাদের বিপদ চুল নিয়ে। উস্‌কো খুস্‌কো তারা থাকতে পারবে না, আবার এক ফোঁটা তেল বেশি পড়ে গেলেও চলবে না। দেখতে একটু বেশি রকমের কুশ্রী এমন একটি ঝি একবার এ-বাড়িতে এসেছিল কাজ করতে, দু' মাসের মাইনে বেশি দিয়ে ও তাকে বিদায় ক'রে দিয়েছিল। এর আগে একটি পাঞ্জাবী ড্রাইভার ছিল নাম ইন্দ্রনাথ, ভারি সুপুরুষ, খুব ভালোবাসত তাকে অঞ্জনা। মোটরে বসে চারপাশের আর কিছুর দিকে ওর চোখ থাকত না, কেবল ইন্দ্রনাথকে দেখত, আর দেখত ওর গাড়ি চালান।

চিন্ময় একবার চোখ তুলে রমলার দিকে তাকাল।

রমলা মৃদু হাসলেন, তারপর দাঁত রসায় একদিন সেই ইন্দ্রনাথের গাল উঠল ফুলে, ও আর বেরোয় না ঘর থেকে, ওঠে না গাড়িতে, মুখ ভার ক'রে ঘরের মধ্যে চুপ চাপ বসে থাকে, বললুম, কি হোলো তোর?

ওকে তুমি হাসপাতালে পাঠিয়ে দাও দিদি, এক্ষুণি।

বলিস কিরে, আর একটা ড্রাইভার ঠিক না ক'রে—, বাবার কাজকর্ম সব বন্ধ হয়ে যাবে যে।

তা হোক গিয়ে, তুমি পাঠিয়ে দাও।

সমস্ত মুখটাই ফুলে গেছে, হাসতে আর পারে না ইন্দ্রনাথ, তবু কথা শুনে হাসবার অদ্ভুত চেষ্টা ক'রে সে বলল, এর জন্যে আবার ডাক্তাদের দরকার কি দিদিমণি, আমি এমনিতেই ভালো হয়ে যাব। অসুখের চেয়ে ডাক্তারকে ইন্দ্রনাথ বেশি ভয় করত। তার আশঙ্কা ছিল ডাক্তার দেখালে সমস্ত দাঁত তারা তুলে ফেলে দেবে। কিন্তু কিছুতেই অঞ্জু শুনবে না, না খেয়েদেয়ে পড়ে রইল। একেবারে ছোট নয় তখন, চৌদ্দপনের বছর বয়স

হবে। শেষ পর্যন্ত ইন্দ্রনাথকে পাঠান গেল জোর ক'রে। কিন্তু সে আর ফিরে এল না। বোধ হয় ডাক্তারও ইন্দ্রনাথ দেখায়নি, দাঁত রসাও তার সম্পূর্ণ সারেনি একেবারে। পরে খোঁজ নিয়ে জেনেছিলাম সে একেবারে দেশে চলে গেছে। বাবার বেশ অসুবিধা হয়েছিল ক'দিন। আর সেই প্রথম এবং সেই শেষ ওকে খুব বকেও ছিলেন। তার কয়েকদিন পর থেকেই হিস্টিরিয়া—তাড়াতাড়ি থেমে গেলেন রমলা।

চিন্ময় আর একবার রমলার দিকে তাকাল। আর সঙ্গে সঙ্গে ঘরে ঢুকল অঞ্জনা। স্নান সেরে শাড়ী বদলে এসেছে। সম্পূর্ণ নতুন দেখাচ্ছে তাকে। সৌন্দর্যের প্রতিমাই বটে। প্রসাধনের সামান্য পরিবর্তনে ওকে একেবার এক এক রকম দেখায়। চিন্ময় মুগ্ধ হয়ে ভাবল, একি শাড়ীর রঙ, না মনের রঙ। কোনো গ্লানি নেই, ক্ষোভ নেই, দৈন্য নেই পৃথিবীতে। শুধু তরল জ্যোৎস্নায় গড়া এই সুন্দরী বসুন্ধরা। অঞ্জনা শুধু নিজেই সাজেনি, আপন সজ্জায় পৃথিবীকে সাজিয়ে তুলেছে।

অর্জুনবাবু বললেন, এসো।

অঞ্জনা বলল, বা, আমাকে দেখেই সব চুপ ক'রে গেলেন যে।

অর্জুনবাবু বললেন, তোমাকে চুপ করেই দেখতে হয়।

কিন্তু ঐ চুরুটটা আগে ফেলে দিন। কি দুর্গন্ধ। হঠাৎ কি মনে পড়ে যাওয়ায় অঞ্জনা শিউরে উঠল, মনে হোলো শুধু চুরুটের নয় আরো যেন কি একটা বিশ্রী গন্ধ সমস্ত ঘরময় ভেসে বেড়াচ্ছে। পাপিয়ার সুরভিতেও তা ঢাকা পড়ছে না।

রমলার চোখের ইসারায় অর্জুনবাবু তাড়াতাড়ি ফেলে দিলেন চুরুটটা।

রমলা বললেন, থাক, আর কোনো কথা নয়, চল সব খেয়ে নেওয়া যাক। বাবাকে তাঁর লিখিবার ঘরে গিয়েই জোর ক'রে খাইয়ে এসেছি। যুদ্ধের বই তো নয়, তিনি যেন নিজেই যুদ্ধক্ষেত্রে নেমেছেন। নাওয়া খাওয়ার

সময় পর্যন্ত নেই। ব্লাড প্রেসারের রোগী, এত অনিয়ম অত্যাচার যদি সয় তো কি বলছি। আবার বেড়ে পড়বে অসুখ, তখন বুঝবেন মজা। ঠাকুর চাকরগুলি বোধ হয় যোগনিদ্রায় অভিভূত। ঠেলে তুললে তবে তাঁরা উঠবেন। এসো সব।

অঞ্জনা বলল, তোমরা খাও গিয়ে দিদি। আমার ভালো লাগছে না, খেতে ইচ্ছে করছে না।

মাত্র দুটিখানি খাবি অঞ্জু, রাত্রে উপোস দেওয়া ভালো নয়।

সব পড়ে রইল। দু'চার চামচ কোনো রকমে মুখে দিয়ে অঞ্জনা টেবিল থেকে উঠে পড়ে বলল, আমার ভারি খারাপ লাগছে। উঠলুম আমি।

রমলা শুষ্ক মুখে বললেন, আচ্ছা তুই যা। একেবারে ঘরে গিয়ে শুয়ে পড়। আমি আসব সঙ্গে ?

না না, তোমাব আসতে হবে না। সবতাতেই বড় বাড়াবাড়ি তোমার দিদি।

কিন্তু খেয়ে উঠে সবাই হাত মুখ ধুতে না ধুতেই অঞ্জনার ঘব থেকে অদ্ভুত শব্দ কানে এল সকলের।

রমলা বললেন, আমি আগেই বুঝেছি।

চিন্ময় বলল, তাহলে খেতে না দেওয়াই উচিত ছিল।

মুহূর্তের মধ্যে অঞ্জনার ঘরের সামনে সবাই এসে জড়ো হয়েছে। বই ছেড়ে উঠে এসেছেন ক্ষিতীশবাবু। চাকরবাকরের ভিড় জমে গেছে দোরে।

বমিতে সমস্ত ঘরটা ভেসে যাচ্ছে। শাড়ীতে লেগে গেছে খানিকটা। নিজের গায়ের গন্ধে অঞ্জনা নিজেই যেন পাগল হয়ে যাবে। একেবারে

সমস্ত বেশবাস খুলে ফেলতে চাচ্ছে অঞ্জনা, আবার সেগুলিকে চেপে ধরছে লজ্জায়।

রমলা সকলের দিকে চেয়ে বললেন, সরে যাও, ভিড় কোরো না এখানে। ভয় নেই অঞ্জনা।

অঞ্জনা চারিদিকে তাকিয়ে বলল, কি নোংরা, কি দুর্গন্ধ, আমাকে এখান থেকে সরিয়ে নিয়ে যাও, শিগ্‌গির সরিয়ে নিয়ে যাও, টিকতে পারছিনে। কি নোংরা আর কি বিশ্রী গন্ধ।

ঘরে ঢুকে দোর বন্ধ ক'রে রমলা ওর কাপড় ছাড়ালেন। তারপর পাশের আর একটা পরিচ্ছন্ন ঘরে নিয়ে খাটের ওপর শুইয়ে দিলেন ওকে। এ ঘর চিন্ময়ের জন্যে ঠিক করা হয়েছে। পুবদক্ষিণ খোলা। জানালা দিয়ে চাঁদের আলো গলে পড়ছে।

কিন্তু খাটে শুয়ে একটুক্ষণ চোখ বুঁজে চুপ ক'রে থেকে অঞ্জনা বার কয়েক নাসিকা কুঞ্চিত ক'রে কষ্টে কিসের ঘ্রাণ নিয়ে মুখ বিকৃত করল, উঁ, এখনও তাই। এখনও সেই নোংরা গন্ধ, আমি টিকতে পারছি না। সমস্ত বাড়িটাই কি নোংরা হয়ে উঠল।

আরো কয়েকবার নাসিকা কুঞ্চিত করল অঞ্জনা, গন্ধে টিকতে পারছি না, আমাকে সরিয়ে নিয়ে যাও।

রমলা এগিয়ে এসে ধমক দিয়ে বললেন, এই চুপ কর, কি ছেলেমানুষি হচ্ছে অঞ্জু। চুপ।

পাশে চিন্ময় দাঁড়ান। রমলা তার দিকে চেয়ে চুপে চুপে বললেন, এই সময় ধমক দিতে হয়, চড়চাপড় দিতে হয় দরকার হলে। কিন্তু ঠেকান গেল না বোধ হয়। রমলা ফিস ফিস ক'রে বললেন, ফিট হচ্ছে আমি আগেই বুঝেছিলাম।

দুটো হাত অঞ্জনা টান ক'রে মেলে ধরল, আঙ্গুলগুলো দৃঢ়মুষ্টিতে আবদ্ধ।

রমলা চিন্ময়কে বলল, দেখ দেখি থামাতে পার কিনা।
চিন্ময় এগিয়ে গিয়ে অঞ্জনার প্রসারিত হাতখানা আস্তে আস্তে সরিয়ে রাখতে চেষ্টা করল। সমস্ত শরীর ঘৃণায় সংকুচিত ক'রে শিউরে উঠল অঞ্জনা, ছি ছি ছি, ছাড়ো ছাড়ো।
সঙ্গে সঙ্গে কি যেন মনে পড়ে গেল চিন্ময়ের। তারপর ধীরে ধীরে সে সরে দাঁড়াল।

গেটে মোটরের শব্দ। ডাক্তার এসে পৌছুলেন।